অপরাজিতা

শারদ সংকলন ♦ সপ্তম সংখ্যা ♦ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

Tejgaon Sanatan Samaj Unnayan Parishad

BBS
...excel your expectation

BANGLADESH BUILDING SYSTEMS LTD.
(Pre-Engineered Steel Building Manufacturer)

ISO 9001 CERTIFIED · ISO 14001 CERTIFIED · ISO 45001 CERTIFIED

Pre-Engineered Steel Building Manufacturer

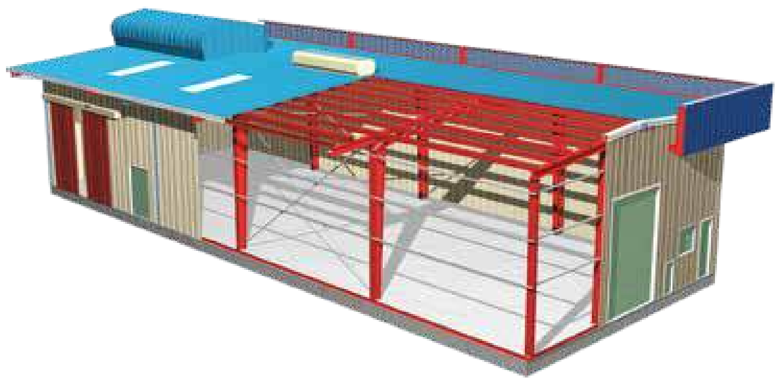

Looking forward to providing service for your next Steel building

Our Specialities

- Factories
- Warehouses
- Hall rooms
- Workshops
- Aircraft Hangers
- Office Buildings
- Showrooms
- Pharmaceutical Industry
- Distribution Centers
- Supermarkets
- Restaurants
- Residential Buildings
- Filling Station
- Light Rooftop Sheds
- Textile Industry

We Provide

- After sales service
- Wide range of design & color
- Architectural support
- Trouble free construction
- Accurate Structure

We Provide

- Wide span
- Low cost
- High quality
- Expandability
- Relocatable
- Quick delivery
- Flexibility in design
- Low maintenance
- Long building life

Head Office:
Configure Bepari Tower (3rd Floor), Ga-64, Middle Badda, Progati Swarani, Dhaka 1212.
+88 02 222294771, 222295915 (Tel); +88 02 222260772 (Fax) | E-mail: info@bbspeb.com

Chattogram Office:
Kader Tower (4th Floor- 09) E.B, 128, Jubilee Road, Chattogram | Tel: +88 031 286 4648

Factory:
Jaina Bazar, Telehate, Sreepur, Gazipur, Bangladesh. | Tel/Fax: +88 0682 55505

www.bbspeb.com

অপরাজিতা

শারদ সংকলন, সপ্তম সংখ্যা, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ
Tejgaon Sanatan Samaj Unnaayan Parishad

শারদীয় দুর্গাপূজা
২০২৩

সম্পাদক
ড. নিখিল চন্দ্র সরকার

সম্পাদনা পর্ষদ
প্রকাশ আদিত্য
অসীম কুমার দাশ
কেশব সেন
প্রদীপ কুমার সাহা

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
প্রদীপ কুমার সাহা, সভাপতি
সুখলাল নন্দী, সাধারণ সম্পাদক
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

সার্বিক সহযোগিতায়
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও ডিজাইন
প্রদীপ কুমার সাহা

প্রকাশনায়
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ
তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা–১২১৫

মুদ্রণে
শব্দকলি প্রিন্টার্স
৭০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা–১০০০
Mob: 01715-596421, E-mail: shabdakoli70@gmail.com

অপরাজিতা

শারদ সংকলন ♦ সপ্তম সংখ্যা ♦ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সূচিপত্র

শুভেচ্ছা বাণী ৪-২৩
সম্পাদকীয় ২৪
আমাদের দুর্গাপূজা ২৭
শারদীয় দুর্গাপূজা : বাঙালির সর্বজনীন উৎসব ২৯
শারদীয় দুর্গাপূজা ৩২
শারদীয় দুর্গাপূজাঃ অসাম্প্রদায়িক চেতনার উৎসব ৩৪
মণ্ডপে নয়, নেপালের ঘরে ঘরে পূজিতা হন দুর্গা ভবানী ৩৭
দুর্গাপূজার সম্প্রীতি ও বাংলাদেশ ৪১
বাঙালির দুর্গাপূজা ৪৪
চণ্ডীতত্ত্ব ও দুর্গাপূজা ৪৬
দুর্গাপূজা ৪৯
দুর্গাপূজা ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৩
ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপূজা ৫৬
অসাম্প্রদায়িক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৫৭
মহালয়া (মাতৃপক্ষ) কি? ৬১
নজরুলের কালীভক্তি ও শ্যামা সঙ্গীত ৬৩
৬৬ হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিতে কাজী নজরুল ইসলাম
৬৯ শক্তি পূজিতা প্রণম্য
৭০ তুমি আসবে বলে
৭১ নিরামিষ কেউ খাইতে পারে না-শ্রীরামঠাকুর
৭৪ কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা, প্যাঁচা ও লক্ষ্মীছাড়া
৭৫ দুর্গাপূজা ও বাঙালির জীবন
৭৭ আনন্দময়ীর আগমনে
৭৭ ঈশ্বরের কাছে দেবতার আহ্বান
৭৮ কর্মে কেন অমানুষ
৭৮ ভাগ্যদেবী
৭৯ "ছি ! রে গদা ছি !"
৭৯ হাঁড়িতে ভাত নাই
৭৯ মা দুর্গার আগমনী
৮১ দুঃখ কমানোর উপায়
৮৩ পুজোর আগমনী বার্তা
৮৪ দুর্গা পুজোর ইতিবৃত্ত
৯০ হিন্দুধর্মের ইতিহাস

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০৮ কার্তিক ১৪৩০
২৪ অক্টোবর ২০২৩

বাণী

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও সারা দেশে যথাযথ উৎসাহ-উদ্দীপনা, আনন্দ এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির মধ্য দিয়ে সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। দুর্গাপূজার সাথে মিশে আছে চিরায়ত বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। আবহমানকাল ধরে এ দেশের হিন্দু সম্প্রদায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে নানা অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে দুর্গাপূজা উদযাপন করে আসছে। দুর্গাপূজা ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি সামাজিক উৎসবও। দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে সমাজের সকল স্তরের মানুষ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী নিয়ে একত্রিত হন, মিলিত হন আনন্দ-উৎসবে। তাই এ উৎসব সর্বজনীন। এ সর্বজনীনতা প্রমাণ করে, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি দুর্গাপূজা দেশের জনগণের মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও ঐক্য সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শারদীয় দুর্গোৎসব সত্য-সুন্দরের আলোকে ভাস্বর হয়ে উঠুক; ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধন আরো সুসংহত হোক- এ কামনা করি।

মানবতা সকল ধর্মের শাশ্বত বাণী। ধর্ম মানুষকে ন্যায় ও কল্যাণের পথে আহ্বান করে, অন্যায় ও অসত্য থেকে দূরে রাখে, দেখায় মুক্তির পথ। তাই ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার পাশাপাশি আমাদেরকে মানবতার কল্যাণে এগিয়ে আসতে হবে। করোনা মহামারি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধসহ বিভিন্ন সংকটের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বিশ্বব্যাপী দেখা দিয়েছে মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বগতি। এর ফলে নিম্ন আয়ের অনেক মানুষ নানা সীমাবদ্ধতার মাঝে দিনাতিপাত করছে। আমি সমাজের দুস্থ ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাঙালির চিরকালীন ঐতিহ্য। সম্মিলিতভাবে এ ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিতে হবে আমোদের সামগ্রিক অগ্রযাত্রায়। আবহমান বাঙালি সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ অসাম্প্রদায়িক চেতনা, পারস্পরিক ঐক্য, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গঠনে কার্যকর অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। বিশ্বে মানুষ ও মানবতার জয় হোক- এ প্রত্যাশা করি।

শারদীয় দুর্গোৎসব সফল হোক
জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৪ কার্তিক ১৪৩০
২০ অক্টোবর ২০২৩

বাণী

হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে আমি দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকল নাগরিককে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দুর্গা পূজা শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসবই নয়, এটি এখন সার্বজনীন উৎসব। অশুভ শক্তির বিনাশ এবং সত্য ও সুন্দরের আরাধনা শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আবহমান কাল ধরে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার'-এ মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশে আমরা সব ধর্মীয় উৎসব একসঙ্গে পালন করি। আমাদের সংবিধানে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সমান অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। সকলে মিলে মুক্তিযুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছি। এই দেশ আমাদের সকলের। বাংলাদেশ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের নিরাপদ আবাসভূমি। যার যার ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সবার উন্নয়ন করে যাচ্ছে। সব ধর্মের মানুষ সমভাবে উন্নয়নের সুফল উপভোগ করছে।

আসুন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রেখে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ তথা জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ সকল নাগরিকের শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৮ অক্টোবর, ২০২৩

বাণী

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ কর্তৃক শ্রীশ্রী শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অপরাজিতা শীর্ষক স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দুর্গাপূজা বাঙালি চেতনার মানসপটে এক সংহতির প্রতীক। অশুভ শক্তির বিনাশ এবং সত্য ও সুন্দরের আরাধনা শারদীয় দুর্গাপূজার প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশে শারদীয় দুর্গাপূজা এই শাশ্বত মন্ত্রে ঐক্যের বন্ধনকে সুদৃঢ় করছে।

বিশ্বের শান্তি, সমৃদ্ধি ও মানব জাতিসহ সকল জীবের কল্যাণ কামনায় সনাতন ধর্মের লোকজন সম্মিলিতভাবে দুর্গাপূজার আয়োজন করে থাকে। অশুভ শক্তির বিনাশ ও কল্যাণের বার্তা নিয়ে বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করা হয় শারদীয় দুর্গাপূজা। শ্রী শ্রী দুর্গাপূজা শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসব নয়। এটি আজ সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। শারদীয় দুর্গোৎসবের এ আনন্দঘন মুহূর্তে আমি হিন্দু সম্প্রদায়ের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বাংলাদেশের অর্জন প্রশংসনীয়। এদেশে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ অংশগ্রহণে হয়ে ওঠে সর্বজনীন। আবহমান কাল থেকে এদেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি বিরাজ করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা'র নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে নজির তৈরি হয়েছে তা অক্ষুণ্ন রেখে দেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তরে আমাদের হতে হবে নিবেদিত প্রাণ।

আমি শারদীয় দুর্গাপূজার সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং স্মরণিকা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ওবায়দুল কাদের, এমপি)

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ সপ্তমবারের মতো এবছরও শারদীয় দুর্গাপূজার আয়োজন করায় পরিষদের সকল নেতৃবৃন্দকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ উপলক্ষ্যে সপ্তমবারের মত প্রকাশ করতে যাচ্ছে **অপরাজিতা** শীর্ষক একটি স্মরণিকা। আমি এ মহৎ উদ্যোগের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। যাদের নিরলস প্রচেষ্টায় এ স্মরণিকাটি প্রকাশ হতে যাচ্ছে তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি এ মহৎ উদ্যোগের সফলতা কামনা করছি।

শ্রী শ্রী দুর্গাপূজা যদিও ধমীয় আনুষ্ঠানিকতায় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের, যা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে নিবেদিত। এ পূজার সাথে জড়িয়ে আছে বাঙালির হাজার বছরের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও অসাম্প্রদায়িকতা। বাঙালি জাতির বৈশিষ্ট্য হলো স্ব স্ব সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণ হয় পৃথকভাবে, কিন্তু উৎসব হয় সব মানুষের। দুর্গাপূজা সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের মাঝে এক সামাজিক বন্ধন ও অসাম্প্রদায়িক পরিচয় বহন করে থাকে, এতে ভ্রাতৃত্ববোধের এক নতুন আবহ তৈরি হয়। এ পূজার উদ্দেশ্য হচ্ছে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির যুদ্ধ এবং অন্যায়, অসত্য ও অনাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার, অন্যায়কে প্রতিহত করার শিক্ষাই মা দুর্গার নিকট হতে শিক্ষণীয়। এ পুজোয় সর্বজনীনতার বাণী সেভাবেই উঠে এসেছে।

বিশ্বের অনেক দেশে মানুষ ধর্মান্ধতা ও সহিংসতায় পীড়িত হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশের মানুষ ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলে মিলেমিশে অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছি। আজকের এ দিনে দেবী দুর্গার নিকট প্রার্থনা দেশ, বিশ্ব, সমাজ থেকে ধর্মান্ধতা দূর হোক। মানুষের মন থেকে দূর হোক হিংসা ও লালসা।

শারদীয় দুর্গোৎসব সবার মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধনকে দৃঢ় থেকে সুদৃঢ় করবে বলে আমার বিশ্বাস। শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আসাদুজ্জামান খান, এমপি)

মন্ত্রী
রেলপথ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের হানাহানি রোধ করে শান্তি ও সমৃদ্ধিসহ সকল জীবের কল্যাণ কামনায় সনাতন হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারন ও লালন করে আসছে। এ পূজার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অশুভ শক্তিকে সমাজ থেকে বিতাড়িত করে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। শারদীয়া দুর্গাপূজার সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কিন্তু উৎসব বাঙালি জাতির সকল মানুষের। এ পূজা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। শারদীয় দুর্গোৎসব আজ সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে সকল সম্প্রদায়ের লোকজন মিলে-মিশে একত্রিত হয়ে উদ্‌যাপন করে আসছে শারদীয় দুর্গোৎসব।

বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায় সকল মানব জাতির সুখ-শান্তি ও মঙ্গল কামনা করে দেবী দুর্গার নিকট প্রার্থনা করে থাকে। শারদীয় দুর্গোৎসব সবার মধ্যে সামাজিক বন্ধন, ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহমর্মিতাকে আরো সুদৃঢ় করুক এ প্রত্যাশা রইল।

এ উপলক্ষ্যে তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ কর্তৃক **'অপরাজিতা'** শীর্ষক প্রকাশনা শারদ সংকলন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ একটি সামাজিক ও অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও শারদীয় দুর্গাপূজার আয়োজন করেছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। এ সংগঠনের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। যাঁদের প্রচেষ্টা, শ্রম ও আন্তরিকতায় এ সংকলনটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তাঁদের সকলকে জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা।

ধর্ম যার যার উৎসব সবার, সকল সনাতন ধর্মাবলম্বীসহ দেশের সকল ধর্মাবলম্বীদের জানাই শারদীয় শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন, এমপি)

মন্ত্রী
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্গাপূজা বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরে পালিত হয়ে আসছে। এ পূজা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মঙ্গল কামনায় খুবই গুরুত্ব বহন করে থাকে। পূজার সময় প্রতিটি মন্দিরে চণ্ডীপাঠ, অর্চনা, আরতি ও ভক্তদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পন করা হয়। অপরদিকে দুর্গাপূজাকে ধমীয় আবেশে আনন্দঘন করে তোলে। দুর্গাপূজা সকলের অংশগ্রহণে পরিণত হয় এক উৎসবে। দুর্গোৎসব মানুষে মানুষে সামাজিক বন্ধনের সৃষ্টি করে। সৃষ্টি করে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতিময় ও কল্যাণময় সম্পর্ক।

দুর্গাপূজা সর্বস্তরের জনগণের মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও ঐক্য সৃষ্টি করে থাকে। পূজাবিধি ও দেবীর প্রতিমার রূপ দুর্গাপূজা সর্বজনীন-প্রতীয়মান হয়। দেবী দুর্গা পূজিত হন সমষ্টিগতভাবে। একই সাথে সিদ্ধিদাতা গণেশ, মহাবীর দেবসেনা (সেনাপতি) কার্তিক, ঐশ্বর্যের (ধন-সম্পদের) দেবী লক্ষ্মী ও বিদ্যার (জ্ঞানের) দেবী সরস্বতী পূজিত হন। দুর্গা দেবীর সঙ্গে তাঁর বাহন সিংহ, গণেশের বাহন ইঁদুর, কার্তিকের বাহন ময়ূর, লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা ও সরস্বতীর বাহন হংস পূজিত হন। পূজার পর শুভ বিজয়া। সমাজের সকল স্তরের জনগণ একত্রে বিজয়ার উৎসব পালন করে। হিংসা-বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে উর্ধ্বে উঠে মানুষে মানুষে সমাবেশ ঘটে পূজার উৎসবস্থলে।

মানব জাতির শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় দুর্গোৎসব পালিত হয়। এ উৎসব শুধু ধমীয় উৎসব নয় যা সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের জনগণ মিলিত হন আনন্দ-উৎসবে। তাই এ উৎসব সর্বজনীন। এ সর্বজনীন উৎসব বাঙালি জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। যার ফলে দেশের সকল ধর্মের নাগরিকের মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও ঐক্য সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এ উৎসবকে কেন্দ্র করে সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দের বন্ধন আরো সুসংহত হউক-এ প্রত্যাশা করি।

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সপ্তমবারের মত শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্গাপূজার আয়োজন করায়, সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে '**অপরাজিতা**' শীর্ষক স্মরণিকাটি যাঁদের শ্রম ও প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এ মহৎ উদ্যোগের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

হিন্দু সম্প্রদায়সহ বাংলাদেশের সকল নাগরিককে জানাই শারদীয় দুর্গাপূজার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি)

মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

বাণী

শারদীয় দুর্গোৎসব হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বহুদেশে আলাদা আমেজ আর বর্ণাঢ্যতায় এটি পালিত হয়। সপ্তাহব্যাপী এ মহোৎসবকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে এখন সাজ সাজ রব। সুন্দর সম্প্রীতির বাংলাদেশে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ এই আনন্দে নিজেদেরকেও সম্পৃক্ত করবে।

বাঙালি সমাজে দুর্গোৎসব আজ সকল শ্রেণির মানুষের জন্য একটি সামাজিক সাংস্কৃতিক বন্ধনে পরিণত হয়েছে। শারদীয় দুর্গোৎসব সকল শ্রেণির মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনুক-এ প্রত্যাশাই করছি। বাংলাদেশ পরিণত হোক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক তীর্থ ভূমি হিসেবে।

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ দুর্গোপূজা উপলক্ষ্যে **'অপরাজিতা'** নামক একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি তাদের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ সকল নাগরিকের শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

(মোঃ আতিকুল ইসলাম)

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রতিমন্ত্রী
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ সপ্তমবারের মতো শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্গাপূজার আয়োজন এবং সে উপলক্ষ্যে **'অপরাজিতা'** শিরোনামে স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২৩ উপলক্ষ্যে আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকলকে জানাই শারদীয় শুভেচ্ছা।

শারদীয় দুর্গাপূজা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। দুর্গতি বিনাশ আর সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় প্রতিবছর ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা পালন করা হয়। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও হিন্দু সম্প্রদায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে নানা উপাচার ও অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছেন। দুর্গাপূজার সাথে মিশে আছে বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। একটি সার্বজনীন উৎসব হিসেবে দুর্গোৎসব পারস্পরিক হৃদ্যতা ও ঐক্য সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির দেশ। সুদীর্ঘকাল ধরে সকল ধর্মের মানুষ এদেশে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছে। আমাদের সংবিধানে সকল ধর্মের সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রতি বছর শারদীয় দুর্গাপূজার সংখ্যা বৃদ্ধি এদেশের অসাম্প্রদায়িকতার বহিঃপ্রকাশ। বর্তমান সরকার প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও প্রতিটি পূজা মণ্ডপে আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং পূজার্চনা নিরাপদ করতে প্রতিটি পূজা মণ্ডপে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে সহযোগিতা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

আমি প্রত্যাশা করছি, শারদীয় দুর্গোৎসব সত্য-সুন্দরের আলোকে ভাস্বর হয়ে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দের বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করবে।

আমি এ স্মরণিকাটির সংকলন পর্ষদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মো: ফরিদুল হক খান, এমপি)

ভাইস-চেয়ারম্যান
হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

বাণী

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে সকল দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বাংলাদেশে দুর্গাপূজা সকলের একটি প্রাণের উৎসব, সর্বজনীন উৎসব। উৎসবের আনন্দে প্রকৃতিসহ গোটা জনপদে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। রচিত হয় সাম্প্রাদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যা আমাদের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যও বটে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের এ উৎসব আজ সকলের অসাম্প্রদায়িক চেতনা আর সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় উৎসবে রূপ নিয়েছে।

বিগত সময়ের ধারাবাহিকতায় এ বছরও তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ শারদীয় দুর্গাপূজার আয়োজন করছে জেনে আমি উদোক্তা এবং আয়োজকদের ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাদের সকল প্রচেষ্টা, উদ্যোগ সফল ও শুভ হোক। সনাতন ধর্মের চিরকল্যাণকর আবহ ছড়িয়ে পড়ুক বাংলাদেশের সকল প্রান্তে। দেবী দুর্গার কল্যাণে আসুরিক শক্তি অমঙ্গলকর, অশুভ চিন্তা চিরদিনের মত মুছে যাক।

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের শারদ সংকলন '**অপারাজিতা**'-এর সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের আদর্শিক চেতনাকে ধারণ করে বিশ্বসভায় মা দুর্গার আশীর্বাদে অচিরেই বাংলাদেশ পরিচিত হবে উদীয়মান সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে। শিউলী আর কাঁশফুলের শুভ্রতায় উদ্ভাসিত হোক বিশ্ব চরাচর।

সবার জন্য রইল শারদ শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

(সুব্রত পাল)

অধ্যক্ষ ও সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা
১০ অক্টোবর ২০২৩

আশীর্বাণী

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ, তেজগাও, ঢাকা-১২১৫, শ্রীশ্রীশারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে স্মরণিকা 'অপরাজিতা'র সপ্তম সংখ্যা প্রকাশ করবে জেনে আমরা আনন্দিত হয়েছি।

আজ থেকে কয়েক হাজার বছর পূর্বে 'বাক্' নামে অম্ভৃণ ঋষির কন্যা দৃপ্ত ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন : "আমিই সমগ্র জগতের ঈশ্বরী, আমি ধনদাত্রী এবং শক্তিদাত্রী। যজ্ঞের দ্বারা যাদের অর্চনা করা হয়, আমি তাদের মধ্যে সর্বত্র। জগৎ-চরাচররূপে আমিই নানাভাবে প্রকাশিতা। আমি সর্বভূতে অন্তর্যামিনীরূপে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছি। সর্বদেশে দেবতা, দানব, মানুষ নানাভাবে আমারই আরাধনা করে। নারী ঋষি বাক্ তাঁর নিজের অন্তরে সেই অনন্তশক্তি যাঁকে আমরা শ্রীশ্রীদুর্গা নামে আরাধনা করি, তাঁকে উপলব্ধি করেছিলেন।

আমরা শ্রীশ্রীদুর্গা মায়ের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হন এবং আমরা যেন অনন্ত শক্তির অধিকারী হতে পারি।

আপনাদের স্মরণিকা প্রকাশ সর্বতোভাবে সার্থক হোক। স্মরণিকা প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

সতত শুভানুধ্যায়ী

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

সভাপতি
বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ
কেন্দ্রীয় কমিটি

বাণী

বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির মূল সুর-ধর্মাচরণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের, কিন্তু উৎসব সব মানুষের। বাঙালি চেতনা থেকে উৎসারিত আবহমান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারায় শারদীয় দুর্গোৎসবের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ পূজোয় সার্বজনীনতার বাণী সেভাবেই উঠে এসেছে।

পুরাণ মতে, অসুরের আস্ফালনে দেবকুল যখন প্রকম্পিত, দেবতারা যার যার অস্ত্র তুলে দিলেন মা দুর্গাকে। মা দুর্গা হলেন দশভুজা। এই দশভুজা মা দুর্গার হাতেই বধ হল অসুর, জয় হল দেবকুলের। অশুভ শক্তি আজও বিরাজমান সর্বত্র। কালের বিবর্তনে আজ এর রূপ হয়েছে ভিন্ন হতে ভিন্নতর। আজ শুধু বাংলাদেশে নয়, সারাবিশ্বের মানুষ ধর্মান্ধতা ও সহিংসতার ভয়াবহ দানবের হাতে পীড়িত হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশের মানুষ আজ সেই অসুরশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছি। এই অশুভ শক্তি বিনাশে আমাদেরও দেবকুলের মত ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, যা আমাদের শক্তি যোগাবে অসুরবধে। এ বিশ্বাসেই অকাল বোধনে প্রতিবছর বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায় দশভুজা দুর্গার আরাধনা হয়।

আজ জগৎজননী মা দুর্গার আগমনে আনন্দ মুখরিত বিশ্ব চরাচর। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাতি নির্বিশেষে দেশ ও কালের সকল ব্যবধান অতিক্রম করে বাংলাদেশে উচ্চারিত হচ্ছে, "ধর্ম যার যার, উৎসব সবার"। দীর্ঘদিনের সংগ্রাম আমাদের সবাইকে আজ এক জায়গায় পোঁছে দিয়েছে। উৎসব এখন ধর্ম নির্বিশেষে সবার, তবে রক্তমূল্যে কেনা এই দেশটাকে "ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার" এই চেতনায় দাঁড় করাতে আমাদের আরও সচেষ্ট হতে হবে বলে আমরা মনে করি।

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে শারদীয় সংকলন প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সম্মানিত সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসকে কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানাই।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে জানাই শারদীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সকল মানুষের কল্যাণ হোক, মানবতার জয় হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

জে. এল. ভৌমিক

সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ
কেন্দ্রীয় কমিটি

শুভেচ্ছা বাণী

বাঙালি সনাতন সম্প্রদায়ের প্রধানতম ধর্মীয় অনুষ্ঠান শারদীয় দুর্গাপূজা। আদ্যাশক্তি মহামায়া শ্রীশ্রী দুর্গা মায়ের পাঁচদিন ব্যাপী পূজা ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে স্বাত্ত্বিকভাবে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশে।

শারদীয় দুর্গাপূজা উৎসবের সার্বজনীনতা অসাম্প্রদায়িক বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম অনুসঙ্গ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শরতের এই উৎসবে সকল মানুষের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ আন্ত-ধর্মীয় সহিঞ্চুতা এবং পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে ইস্পাতসম দৃঢ় করে। কর্মময় সমাজ জীবনে সকল ধর্মের মানুষের পারস্পরিক উৎসবে অংশগ্রহণ অসাম্প্রদায়িক মানবিক চেতনাকে দৃঢ় এবং পরিশীলিত করে।

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রসুত অপশক্তি মাঝে মাঝে সনাতন সম্প্রদায়সহ অপরাপর ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের উপর হামলা, নির্যাতন-নিপীড়ন এর মাধ্যমে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ম্লান করে দিচ্ছে। এই অপশক্তিকে রুখে দাঁড়াতে না পারলে বঙ্গবন্ধু'র আকাঙ্খিত অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলাকে এগিয়ে নেয়া অসম্ভব হবে।

দশভূজা দেবী দুর্গা আসুরিক শক্তিকে বিনাশ করে, শুভ শক্তির জয়ের মধ্যে দিয়ে ধরণীকে রক্ষা করেন। আমরাও মায়ের আরাধনা করি আমাদের ভিতরের ও সমাজের পাশবিক শক্তিকে পরাভূত করে শুভ শক্তির জয়ের জন্য। মানবসভ্যতা কখনো অপশক্তির কাছে হার মানেনি। তাই এবারের পূজোয় দেবী দুর্গার কাছে আমাদের প্রার্থনা থাকবে বিশ্ব যেন দ্রুত রোগমুক্ত হয়, সন্ত্রাস মুক্ত হয়, সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত হয় এবং আসুরিক শক্তিকে দমনে মা যেন আমাদের শক্তি ও সাহস দেন। বিশ্ব যেন হয় প্রকৃতপক্ষে মানুষসহ সকলের প্রাণের প্রকৃত আবাসযোগ্য বাসস্থান।

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে শারদীয় সংকলন প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সম্মানিত সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসকে কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানাই।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে জানাই শারদীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সকল মানুষের কল্যাণ হোক, মানবতার জয় হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার

সভাপতি
মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি

শুভেচ্ছা বাণী

শারদীয় দুর্গোৎসবে বিশ্ববাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

মাতৃবন্দনার এক নতুন একবিশ্ব গড়ার লক্ষ্য নিয়ে আমরা সমবেত হয়েছি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাক-হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে যে বিজয় এসেছিল, এবারের শারদোৎসবে নতুন করে সেই বিজয়ের মন্ত্র ধ্বনিত হোক। আসুরিক শক্তি সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়নি, এখনো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নসাৎ করার ষড়যন্ত্র কোনো কোনো মহল লিপ্ত রয়েছে। আমরা প্রশ্ন করতে চাই, মুক্তিযুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পার হলেও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মনে আজো কেন হতাশার সুর বাজবে? ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ধারা কেন বারবার রুদ্ধ করার অপচেষ্টা হবে? এই বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মান্ধতার অসুররা আজও সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শক্তির মধ্যে বিভাজন বাড়ছে। 'রাষ্ট্রধর্ম' করার জন্য আমরা মুক্তিযুদ্ধ করিনি। দেশ আমাদের মা, অসুরদের হাত থেকে মা-কে রক্ষা করতে হবে।

দেশ আজ এক ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। সংবিধান অনুযায়ী জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি. মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবার কথা। কিন্তু নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা নিয়ে বিরোধীদলের বিপরীতমুখী অবস্থানের কারণে নির্বাচন নিয়ে নানা শঙ্কা ও সংশয়ের মধ্যে আছে মানুষ। নির্বাচন হিন্দুদের কাছে এক আতঙ্ক ও বিপর্যয়। অতীতের একাধিক নির্বাচন পূর্বাপর পরিস্থিতি হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য সুখকর হয়নি। বিভিন্নভাবে সংখ্যাগুরুদের মধ্যে পালিত অপশক্তি দ্বারা নির্যাতন, নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। আমরা আশা করি, নির্বাচন নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা অচিরেই নিরসন হবে এবং সবরকম সহিংসতা বর্জন করে সব দলের অংশগ্রহণে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পথে দেশ এগিয়ে যাবে। আমরা চাই, আগামী নির্বাচনে আবারও গণতান্ত্রিক শক্তি ও অসাম্প্রদায়িক দল বিজয়ী হোক। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকশিত হোক। সেইসঙ্গে সকল প্রকার ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, আগ্রাসন, সাম্প্রদায়িকতা, কর্তৃত্ববাদ, জঙ্গিবাদ নিপাত যাক ও নির্মূল হোক।

স্বাধীন দেশে এক দুঃসময়ে আমরা একত্রিত হয়েছিলাম শারদীয় দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি ও বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ। এই পুজো অঙ্গনের দুই প্রতিষ্ঠান অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পথ নির্দেশ করছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারের দায়িত্ব নেবার পর অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্ঠা অব্যাহত রয়েছে বলে আমরা মনে করছি। সকল অসাম্প্রদায়িক জনগোষ্ঠীকে সংগে নিয়ে দীর্ঘ আন্দোলনে হিন্দু সম্প্রদায়ের মনোবল ও সাংগঠনিক শক্তি বেড়েছে। এই পরিবেশ ও সাংগঠনিক শক্তি ধরে রাখতে হবে। রাষ্ট্র ও সমাজকে অসাম্প্রদায়িক ভাবধারার শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে।

আমরা অঙ্গীকার ঘোষণা করছি, আমরা পরিপুরক শক্তি হিসেবে অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সামনের কাতারে থাকবো। এছাড়া আমাদের কোনো বিকল্প নেই। সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতা মহান মানবিকতার সামনে পরাজিত ও নতজানু হতে বাধ্য। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

শারদীয় দুর্গোৎসব জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবার জীবনে কল্যাণ বয়ে আনুক। পুজোয় সবাই সুখী হোক, সমৃদ্ধি আসুক। প্রতিটি গৃহকোণ আনন্দে ভরে উঠুক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

মনীন্দ্র কুমার নাথ

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ
Tejgaon Sanatan Samaj Unnayan Parishad

সাধারণ সম্পাদক
মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি

বাণী

বাঙালির সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। জগজ্জননীর পূজার আয়োজন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা করলেও, ধর্ম নির্বিশেষে গোটা বাঙালি সমাজে এই সার্বজনীন উৎসবের প্রভাব পূজার প্রচলন থেকেই আমরা লক্ষ্য করি। প্রকৃতিও যেন শারদোৎসবের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। দেবী বন্দনায় এই সম্মিলিত আয়োজন পূজার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। এই কারণেই শারদীয় দুর্গোৎসব বাঙালি সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধন ঘটায়।

বাংলাদেশের দুর্গাপূজা ঐতিহাসিক কারণে গোটা উপমহাদেশে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই অঞ্চলে, রাজশাহীর তাহেরপুরে প্রথম প্রতিমায় দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়েছিল। রাজা কংসনারায়ণ সোনার প্রতিমা গড়ে প্রথম দুর্গাপূজা করেন। আরেক ঐতিহাসিক তথ্য হচ্ছে, চট্টগ্রামে করলডেঙ্গা পাহাড়ে রাজা সুরথ প্রতিমায় দেবী বন্দনা করেছিলেন। এই দুই তথ্য শারদীয় দুর্গাপূজার ভিত্তি যে এই বাংলায়, তা নির্দেশ করে। এবং এটা ইতিহাসেরও অংশ। স্বাভাবিকভাবে আমরা এই ইতিহাস ধারণ করি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় সর্বজনীন সংস্কৃতির বিকাশে শারদীয় দুর্গোৎসবের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দুর্গাপূজা সারাবাংলায় সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। এক সময় ব্যক্তিগত পূজা প্রধান হলেও এখন সর্বজনীন পূজাই মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। প্রতিবছর দুর্গাপূজার সংখ্যা বাড়ছে, উৎসবের আঙ্গিক প্রশস্ত হচ্ছে। মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি ও বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির থেকে 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার' স্লোগানের সূচনা করে সর্বজনীনতাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে; আর এই স্লোগান আজ সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকেও উচ্চারিত হচ্ছে। এটা আমাদের এক বড়ো অর্জন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর ক্ষমতা দখলকারীরা সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে হাতিয়ার করে বাংলাদেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার হরণ করেছিল, মুক্তিযুদ্ধের সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করেছিল, তারই প্রতিবাদে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তির পরিপূরক শক্তি হিসেবে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল শারদোৎসবকে সামনে রেখে। আজ দেবী দুর্গার আরাধনায় আমরা অশুভ শক্তির বিনাশে প্রত্যয়দীপ্ত হই। সনাতন হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজার্চ্চনা সত্য-সুন্দরের প্রতিষ্ঠা ও শুভ শক্তির জয়ে নিবেদিত।

পুজোর সংখ্যা বাড়ুক, সেটা আনন্দের। কিন্তু মায়ের আরাধনা অবহেলা-অনাদরে নয়, ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে ও পবিত্র পরিবেশে যেন আয়োজিত হয়, এটা নিশ্চিত করতে হবে প্রত্যেক পূজা কমিটিকে। নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে হবে।

পুজোর আনন্দ ছড়িয়ে দিতে হবে সবার মাঝে। শারদ শুভেচ্ছা সবাইকে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

রমেন মণ্ডল

সভাপতি
তেজগাঁও থানা আওয়ামী লীগ

বাণী

শারদীয় দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা।

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ বিগত সময়ের ধারাবাহিকতায় এবারও শারদীয় দুর্গাপূজার সুন্দর আয়োজন করছে জেনে আমি আয়োজক বঙ্গবন্ধু উদোক্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা শেখ মুজিবর রহমানের স্বপ্নের এ সোনার বাংলার সকল ধর্মের এক অপূর্ব পবিত্র মিলনস্থান। তাঁর এ স্বপ্নধারাকে এগিয়ে নিতে আমরা সব সময় জাগ্রত এবং আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছি।

বাংলাদেশে বর্তমানে শারদীয় দুর্গোৎসব কেবলমাত্র হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। সকল ধর্মের জনমানুষের অংশগ্রহণে তা আজ জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। তেজগাঁও অঞ্চলে সকল পূজা মণ্ডপে মানুষের আন্তরিক উপস্থিতি, সৌহার্দপূর্ণ অবস্থান আমাকে আপ্লুত করে, আনন্দিত করে।

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের নিয়মিত প্রকাশনা শারদ সংখ্যা "অপারাজিতা" প্রকাশের উদ্যোগ এবং আয়োজনকে স্বাগত জানাই। শুভকামনা "অপারাজিতা" সম্পাদনা পরিষদের সকলের জন্য।

সকল আসুরিক, অশুভ তৎপরতা মুছে গিয়ে, বিশ্বে শুভ সুন্দর মানবিকতা ছড়িয়ে পড়ুক, এ কামনা করি।

সবার জন্য শারদীয় শুভেচ্ছা। আসুন আমরা সবাই মিলে অসাম্প্রদায়িক স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

(প্রফেসর মোঃ আবদুর রশীদ)
সাবেক অধ্যক্ষ, তেজগাঁও কলেজ

কাউন্সিলর
২৬ নং ওয়ার্ড
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

শুভেচ্ছা

শারদীয় শুভেচ্ছা।

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ তাদের দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় এবারও শারদীয় দুর্গাপূজার আরম্ভর আয়োজন করছে জেনে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে উদ্যোক্তা, ভক্তবৃন্দ এবং এলাকাবাসীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবনা দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা সত্য, সুন্দর ও কল্যাণে বিশ্বাসী। স্থানীয় জনগণের ভালোবাসায়, সহযোগিতায় এবং আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এলাকায় মন্দির, মসজিদ, গীর্জার সুন্দর সহঅবস্থান এবং ধর্মচর্চা সকলের কাছে প্রশংসিত এবং সমাদৃত হয়েছে।

আমি এ মন্দিরকে আর্বত করে নানা ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোর সংগে যুক্ত থাকতে পারি বলে নিজেকে ধন্য মনে করি এবং আয়োজকদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমাদের এলাকায় সকল ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভ্রাতৃত্ববোধ, পারস্পরিক সহযোগিতা এক অন্যন্য সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। আমি সব সময় স্থানীয় জনগণকে নিয়ে সুন্দর একটা আবহ তৈরি করতে চাই। আমি তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সমৃদ্ধি ও সফলতা কামনা করি।

শারদ সংখ্যা "অপরাজিতা" প্রকাশনার ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হউক। এ প্রকাশনা পাঠকদের সকলকে শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সকলের জন্য শারদীয় উৎসবের শুভেচ্ছা। আসুন আমরা সবাই মিলে একটি সুন্দর সোনার বাংলা গড়ে তুলি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

(শামীম হাসান)

সভাপতি
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

শুভেচ্ছা

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা। তেজগাঁও এলাকার সকল ধর্মের মানুষের সামাজিক, আর্থিক এবং মানবিক সহযোগিতায় এবারও আমরা শারদীয় দুর্গোৎসব উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি। তাই আয়োজনের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ঢাকা উত্তরের মেয়র, ২৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর, সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর, এলাকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনের সকল শ্রেণির নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দকে।

শারদীয় দুর্গোৎসবের আয়োজন অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান অপেক্ষা ব্যাপক, শ্রমসাধ্য, সময় সাপেক্ষ এবং আর্থিকভাবে ব্যয়বহুল কর্মকাণ্ড। এ কর্মযজ্ঞে আমাদের সম্মানিত উপদেষ্টা, সহযাত্রী ইসি কমিটি, সাধারণ সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন উপকমিটি, যাদের নিরলস শ্রম, মেধা এবং সাংগঠনিক কর্মতৎপরতায় বিগত বছরের মত এবারও সুশৃঙ্খল ও সুন্দরভাবে উৎসব পালন করতে পারবো বলে বিশ্বাস রাখি। এ সকল কাজে আমাদের সঙ্গে আছেন বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহ।

ধীরে ধীরে এ দুর্গা মন্দিরের পবিত্র আবহ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মায়ের কৃপায় ভক্তবৃন্দের সম্পৃক্ততা ও সমাগম ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। সবাইকে সঙ্গে করে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি মায়ের জন্য দৃষ্টিনন্দন একটি বৃহদাকার মন্দির নির্মাণের দিকে। সাত-আট বছর তেমন বড় সময় নয়, তবুও মায়ের আশীর্বাদে ইতোমধ্যে তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ ঢাকা মহানগরসহ সারা বাংলাদেশে ভৌত-অবকাঠামো, সাংগঠনিক দক্ষতায় একটি সম্মানিত জায়গায় পৌঁছে গেছে। এ কৃতিত্ব সম্ভব হয়েছে স্থানীয় প্রশাসনের গভীর পৃষ্ঠপোষকতা, সকল ধর্মীয় মানুষের সহযোগিতা এবং আমাদের স্বপ্নসারথি সহযোগীদের অক্লান্ত শ্রম আর মেধায়। তাই কৃতজ্ঞ চিত্তে সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি জানি এ পথ ততটা মসৃন নয়, নানা প্রতিবন্ধকতা, মতের মিল-অমিল থাকবে, তবুও সকল সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে স্বপ্নের সিঁড়ি ভেঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। ভালো খবর এবং গর্বের বিষয় আমাদের উপর এলাকাবাসীর যথেষ্ঠ আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে, বলে আমি মনে করি।

আসুন সকলে মিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর ও ন্যায়ভিত্তিক সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলি। দুর্গা-মায়ের আশীর্বাদে নিজেদের হৃদয় মন্দিরকে পবিত্র করে তুলি।

সকলে সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন।

(প্রদীপ কুমার সাহা)

সাধারণ সম্পাদক
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

শুভেচ্ছা

বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্গাপূজা । পুরাণ মতে, অসুরের অত্যাচার ও নিপীড়নে দেবকুলের সকলে যখন অত্যাচারিত, তখন সব দেবতারা একত্রিত হয়ে নিজ নিজ অস্ত্র তুলে দিলেন মা দুর্গাকে। সকল দেবতার প্রার্থনা ও সম্মিলিত তেজে মা দুর্গা আবির্ভূত হয়ে মহিষাসুরকে বধ করেন। দেবকুল হয় অসুর মুক্ত। জয় হয় দেবকুলের। দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী। দেবী দুর্গা মানবজাতির সকল অন্যায়,অত্যাচার ও অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য মনুষ্যকুলে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। প্রতি বছর শরৎকালে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে দেবী দুর্গার পূজা-অর্চনা অনুষ্ঠিত হয়। আসুন সকলে মিলে-মিশে মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করি যেন সকল অশুভ শক্তির বিনাশ করে মঙ্গল বয়ে আসুক। আরো প্রার্থনা দেশ, বিশ্ব ও সমাজ থেকে ধর্মান্ধতা ও বর্বরতা দূর হোক। মানুষের মন থেকে দূর হোক লোভ, লালসা ও প্রতিহিংসা।

বাংলাদেশে সারা বিশ্বের কাছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ হিসেবে প্রশংসা অর্জনে সামর্থ হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত "ধর্ম যার যার উৎসব সবার" এ শ্লোগানকে সম্মান প্রদর্শন করে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মের লোকজন নিজ নিজ ধর্মীয় উৎসব যথাযোগ্য মর্যাদায় ও ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ করে পালন করে যাচ্ছে।

তেজগাঁও এলাকায় কোন মন্দির না থাকায় এলাকার সাংসদ ও মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দসহ সকলের সার্বিক সহযোগিতায় বিকে আফতাব মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকটে 'তেজগাঁও সর্বজনীন পূজা মন্দির' স্থায়ীভাবে স্থাপিত হয়েছে। এ মন্দিরে প্রতিদিন শ্রী শ্রী দুর্গা মায়ের পূজা-অর্চনা, প্রতি শনিবার শনিপূজা, প্রতি শুক্রবার গীতা পাঠ, ভগবান শ্রী কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উদ্‌যাপন, লোকনাথ বাবার জন্মতিথিসহ অপরাপর পূজা-পার্বন যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হচ্ছে। মন্দির প্রতিষ্ঠার সহযোগিতার জন্য সকল স্তরের লোকজনের প্রতি রইলো আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ।

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ বিগত ছয় বছরের ন্যায় এ বছরও 'তেজগাঁও সর্বজনীন পূজা মন্দির'-এ শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। এ পরিষদের সম্মানিত উপদেষ্টামণ্ডলী ও নির্বাহী পরিষদের সকল সদস্যসহ সাধারণ সদস্য এবং যুব পরিষদের সদস্যবৃন্দের নিরলস প্রচেষ্টায় শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে বলে আমি তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে 'অপরাজিতা' শিরোনামে একটি শারদ সংকলন। এ সংকলন প্রকাশে গঠিত 'সংকলন পর্ষদের' সম্পাদকসহ সকল সদস্য আন্তরিকতার সাথে কাজ করার ফলে সংকলনাটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দুর্গাপূজায় যাঁরা মূল্যবান উপদেশ, বিজ্ঞাপন ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি রইলো গভীর কৃতজ্ঞতা।

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ সকলের শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা।

(সুখলাল নন্দী)

ড. নিখিল চন্দ্র সরকার
সম্পাদক
অপরাজিতা সংকলন পর্ষদ
ও
উপদেষ্টা
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

সম্পাদকীয়

শারদীয় দুর্গাপূজার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করা এবং সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আরাধনা করা। বাংলাদেশে সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কিন্তু উৎসব সকল মানবজাতির। ফলে এ পূজা আজ সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে । তাই সকলের নিকট এ পূজার গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। যার ফলে এ পূজা সকলের মিলনে দুর্গোৎসবে পরিগণিত হয়েছে। এখানে উৎসবের আনন্দে বাঙালি জাতির প্রাণের সঞ্চার হয়। উদ্যোক্তা কিংবা আয়োজক শুধু হিন্দুসম্প্রদায় নয়, অন্য সম্প্রদায়ের উপস্থিতি লক্ষণীয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পূজার শুরু থেকে বিসর্জন পর্যন্ত সকল আয়োজনে সকলের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। দুর্গোৎসবকে ঘিরে আনন্দঘন পরিবেশ এবং মিলন খুবই বিরল। এ পূজা বাঙালি সমাজকে অসহিষ্ণুতা, হিংসা, বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত করে মানুষের মধ্যে ঐক্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠা করে। ঐক্যবদ্ধ করে সমগ্র বাঙালিকে। এক মায়াবী বন্ধনে জড়িয়ে রাখে সকল বাঙালিকে। বিশ্বের হানাহানি রোধ করে শান্তি ও সমৃদ্ধিসহ সকল জীবের কল্যাণ কামনায় বাঙালির অন্যতম উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব বাংলাদেশে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক, কারণ এ উৎসব হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারন ও লালন করে আসছে। বাংলাদেশে শারদীয় দুর্গোৎসব সকল সম্প্রদায়ের লোকজন মিলে-মিশে একত্রিত হয়ে উদ্‌যাপন করে থাকেন। আসুন, সুখ-শান্তি ও মঙ্গল কামনা করে দুর্গতিনাশিনী দুর্গামায়ের নিকট সকলের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করি। শারদীয় দুর্গোৎসব সবার মধ্যে সামাজিক বন্ধন, সম্প্রীতি ও সহমর্মিতাকে আরো সুদৃঢ় করুক এ প্রত্যাশা রইল।

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ সপ্তমবারের মত শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। এ পূজা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে স্মরণিকা 'অপরাজিতা'র' শারদীয় সংকলনের সপ্তম সংখ্যা। এ সংকলনটি অতীতের স্মৃতিচারণ, মূল্যবান বাণী, প্রথীত যশা লেখকগণের লেখা ও বিজ্ঞাপন সমন্বয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। শারদীয় সংকলন প্রকাশ করা একটি দীর্ঘ সময়ের বিশাল কর্মযজ্ঞ। সম্পাদনার দায়িত্ব আমার হলেও সম্পাদনা পর্ষদ, তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের উপদেষ্টা পরিষদ এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দের একান্ত সহযোগিতা ব্যতীত এ প্রকাশনাটি প্রকাশ করা কোনক্রমেই সম্ভব হতনা। তাঁদের সকলের প্রতি রইলো অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ শারদ সংকলনে মূল্যবান বাণী প্রদান করায় সংকলনের মান উচ্চ শিখরে উপনীত হয়েছে। আমি তাঁদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মাননীয় মন্ত্রীবর্গ ও মেয়রসহ অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ নিজ নিজ অবস্থানে থেকে এ শারদ সংকলনে বাণী প্রদান করে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। যাঁদের মূল্যবান লেখা ব্যতীত স্মরণিকাটি প্রকাশ করা সম্ভব হতো না তাঁদের সকলের প্রতি রইলো আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। এ শারদীয় সংকলনে দেবী দুর্গার বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক দিক নিয়ে লেখা, প্রবন্ধ ও কবিতাসহ অন্যান্য ধর্মীয় তথ্যসমৃদ্ধ লেখা নিয়ে সহজতর ও নির্ভুল উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে পরিষদের মুখপাত্র হিসেবে স্মরণিকাটি প্রকাশের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। এ স্মরণিকা প্রকাশে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য নিবেদন করছি। পরিশেষে সকলের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য দুর্গা মায়ের নিকট প্রার্থনা করছি।

সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা।

(ড. নিখিল চন্দ্র সরকার)

স্থায়ী সনদ প্রাপ্ত

ATISH DIPANKAR UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY (ADUST)

Approved by
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

NEAR METRO STATION UTTARA NORTH

Admission Open

Programs offered

UNDERGRADUATE PROGRAMS

- B.Sc. in Robotics, Mechatronics and Automation Engineering (RMAE)
- B.Sc. in Computer Science & Engineering (CSE)
- B.Sc. in Electrical & Electronic Engineering (EEE)
- B.Sc. in Textile Engineering
- B.Sc. in Civil Engineering (CE)
- Bachelor of Pharmacy (B. Pharm.)
- Bachelor of Laws (LLB)
- Bachelor of Business Administration (BBA)
- BBA in Agribusiness
- Bachelor of Fashion Design and Technology
- BA (Hon's) in English
- Bachelor of Education (BEd)

GRADUATE PROGRAMS

- Master of Business Administration (MBA)
- Executive MBA (EMBA)
- MBA in Agribusiness
- Executive MBA in Agribusiness
- Master of Pharmacy (M. Pharm)
- Master of Public Health (MPH)
- Master of Laws (LLM)
- MA in English
- MA in ALELT
- MA in Applied Linguistics and ELT
- Master of Education (MEd)
- PGDIT

Facilities

- Modern Library with e-book facilities
- Modern lab facilities
- Well-developed Roboties Lab
- Transport and Hostel facilities

Scholarship / Waiver

- 100% for children of freedom fighters
- 75% for golden GPA 5.00
- Additional 5% for group admission
- Additional 10% for ADUST Graduates
- Additional 5% for female students

fb.com/ADUST2004
www.adust.edu.bd

E-mail: info@adust.edu.bd
Cell: +8801787 666575-8
Permanent Campus: Sector-15, Uttara, Dhaka-1230

Quality & Update Medical Equipment Distributor

New Vision
Medisystem

DISTRIBUTOR

MEDISPEC USA
esaote ITALY
MEDILINK FRANCE
BTL UK
Brandon UK
STEPHAN GERMANY
Assing ITALY
NITROCARE TURKEY
INNOMED HUNGARY

17/2 (3rd Floor), New Eskaton Road, Moghbazar, Dhaka – 1000.
Phone No.: 02 48311483, 48314728, Mobile : 01819281713, 01914983303
E-mail: newvisionmed@gmail.com

আমাদের দুর্গাপূজা

শারদীয় দুর্গাপূজা শাশ্বত বাঙ্গালি জাতির একটি সামাজিক উপাখ্যান। বাঙালির চিরায়ত জীবন প্রণালীর আটপৌরে চালচিত্র রূপায়িত হয় পূজা অর্চনার নানা অনুসঙ্গে। প্রথম দর্শনে মণ্ডপগুলোতে উপলব্ধি আসে একটি সুন্দর পারিবারিক আবাহ। অতঃপর ভাবনায় আসে নানা শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব, অশুভ নিধনের চরম উন্মাদনা। রয়েছে প্রশাসনিক এক চমৎকার শৃঙ্খল, মা দুর্গার সাচিবিক কার্যক্রমের অদূরে অবলোকন আর পর্যবেক্ষণে রয়েছে মহাশক্তিমান শিব শংকর। শিক্ষার আলো হাতে মা সরস্বতী, অপার ধন সম্পদের কোটরে মা লক্ষ্মী, সময়ের সুদর্শন কার্তিক আর ব্যবসায়িক ধন-পুজি আর জাতির অর্থনৈতিক অগ্রগতির মশাল হাতে গনেশ। তাই এটা যে আমাদের পরম আত্মার আত্মীয় তা সম্বোধনে এবং অলংকরণে বড়ই মনকে নাড়া দেয়। তাই দুর্গাপূজার আহবানে চিরাচরিত বাঙালি সমাজতত্ত্বের এবং সংকৃতির ধারাবাহিক এক পরমপরা দেখা যায়। নবপত্রিকা এবং হংস লক্ষ্মীপেচা ময়ুর, ইঁদুর, মহাশক্তিমান সিংহ প্রকৃতি এবং জীব বৈচিত্র্যকে মানুষের ভালোবাসার জায়গায় নিয়ে আসে।

আসুন মন মন্দিরকে পবিত্র করে তুলি, হাত বাড়িয়ে ভ্রাতৃত্বকে জাগিয়ে তুলি, থামিয়ে দিই নতুন নতুন বৃদ্ধাশ্রম তৈরি করার চিন্তা। আমাদের পরিবার আর সংসার হোক এক একটি আনন্দ-আশ্রম। হানাহানি বন্ধ হউক, বিশ্ব নিরাপদ হউক।

Panorama Washing Co. Ltd.

A Sister Concern of Panorama Group

শারদীয় শুভেচ্ছা

A Complete Washing House

Kodda Nandun, Nawzor, Gazipur, Bangladesh
Tel: +88-02-9262607, 9262608, Cell: 01711 528 264
E-mail: kabir@panoramawclbd.com

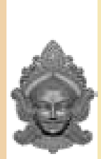

শারদীয় দুর্গাপূজা : বাঙালির সর্বজনীন উৎসব

অধ্যাপক ড. অসীম সরকার

'দুর্গ' (দুর্‌- গম্‌+ড) শব্দের সঙ্গে টাপ্‌প্রত্যয়যোগে 'দুর্গা' (দুর্গ+স্ত্রিয়াং টাপ্‌) শব্দটি গঠিত হয়েছে। শব্দকল্পদ্রুম গ্রন্থ অনুসারে দুর্গ (বা দুর্গম) নামক অসুরকে যিনি বধ করেন তিনিই দুর্গা (দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা বা প্রকীর্তিতা)। দুর্গম অসুরের কাজ হলো জীবের দুর্গতি প্রদান। দেবী দুর্গম অসুরকে বধ করে জীবের দুর্গতি নাশ করেন। জীবের দুর্গতি নাশ করেন বলেও তাঁকে দুর্গা (দুর্গতিনাশিনী) বলা হয়। দেবী দুর্গা মহাবিঘ্নাদিনাশিনী, বিপত্তারিনী এবং দুঃখ-দুর্দশাবিনাশকারিণী। হিন্দুশাস্ত্রে দুর্গা শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –

"দৈত্যনাশার্থবচনো দকারঃ পরিকীর্তিতঃ।
উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মত ॥
রেফো রোগঘ্নবচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ।
ভয়শত্রুঘ্নবচনশ্চকারঃ পরিকীর্তিতঃ ॥"

অর্থাৎ 'দ' অক্ষর দৈত্যনাশক, উ-কার বিঘ্ননাশক, রেফ(´)রোগনাশক, গ-অক্ষর পাপনাশক এবং আ-কার ভয় ও শত্রুনাশক। অর্থাৎ দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ, ভয় ও শত্রুর হাত থেকে যিনি রক্ষা করেন, তিনিই দুর্গা। সকল প্রকার বিপদ থেকে যিনি জীবকে রক্ষা করেন, জগতের কল্যাণ সাধন করেন এবং মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করেন, তিনিই হচ্ছেন দেবী দুর্গা। তিনি আদ্যাশক্তি, মহামায়া, শিবানী, ভবানী, দশভুজা, দশ প্রহরণধারিণী, জয়দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, জগজ্জননী, গন্ধেশ্বরী, বনদুর্গা, চণ্ডী, নারায়ণী প্রভৃতি নামে ও বিশেষণে অভিহিত হন। পুরাণে কথিত আছে যে, আদ্যাশক্তি মহামায়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের লক্ষ্যে এবং সমগ্র জীবের কল্যাণার্থে যুগে যুগে ও কালে কালে বিভিন্নরূপে ভিন্ন ভিন্ন নামে আবির্ভূত হয়েছেন। দেবী দুর্গা তাঁরই বিশেষ সময়ের, বিশেষ যুগের এক বিশেষরূপ। দেবী দুর্গা শক্তির দেবী। তিনি মানুষের শক্তির প্রেরণা। তিনি সত্য, সুন্দর, কল্যাণ ও শুভ শক্তির প্রতীক।

শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে প্রাচীনকালে ব্রহ্মার বরে পুরুষের দ্বারা অবধ্য পরাক্রমশালী, নিষ্ঠুর, অত্যাচারী মহিষাসুর দেবগণকে এক যুদ্ধে পরাস্ত করে স্বর্গের অধিকার কেড়ে নেয় এবং স্বর্গ থেকে দেবতাদের বিতাড়িত করে দেয়। স্বর্গ থেকে বিতাড়িত দেবগণ মহিষাসুরকে হত্যা করে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করার জন্য প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং পরে তাঁকে মুখপাত্র করে বিষ্ণু(নারায়ণ) এবং শিবের সমীপে উপস্থিত হন। মহিষাসুরের কাহিনি শুনে তাঁরা উভয়েই অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন। সেই ক্রোধে তাঁদের মুখমণ্ডল ভীষণাকার ধারণ করে। প্রথমে বিষ্ণুর ও পরে শিব ও ব্রহ্মার মুখমণ্ডল থেকে এক মহাতেজ নির্গত হয়। দেবরাজ ইন্দ্রসহ অন্যান্য দেবতার দেহ থেকেও সুবিপুল তেজ নির্গত হয়ে মহাতেজের সঙ্গে মিলিত হয়। সু-উচ্চ হিমালয়ে স্থিত ঋষি কাত্যায়নের আশ্রমে সেই বিরাট পর্বত প্রমাণ ও উজ্জ্বল তেজঃপুঞ্জ একত্রিত ও ঘনীভূত হয়ে অগ্নিবর্ণা, মহাতেজস্বিনী, পরমরূপবতী এক দেবীমূর্তিধারণ করে (কাত্যায়নের আশ্রমে আবির্ভূত হওয়ায় এই দেবী কাত্যায়নী নামেও অভিহিত হন)। এক এক দেবতার প্রভাবে দেবীর এক এক অঙ্গ উৎপন্ন হয়। দেবগণের সম্মিলিত শক্তির সংহত বা মিলিতরূপ(প্রতিমূর্তি) থেকে আবির্ভূত মহাশক্তির অধিষ্ঠাত্রী এই দেবী হলেন দুর্গা। সমুদ্র ও বিশ্বকর্মা দেবীকে বহুরকম অলংকার দান করেন। দেবগণও বিভিন্ন প্রকার অলংকার দিয়ে দেবীকে সজ্জিত করেন। তারপর দেবগণ প্রত্যেকে তাঁদের নিজ নিজ আয়ুধ বা অস্ত্র দেবীকে দান করেন। হিমালয় দেবীকে বাহন হিসেবে সিংহকে দান করেন (সিংহ দুর্গার বাহন বলে তাঁর আর এক নাম সিংহবাহনা)। দেবতাদের শক্তিতে শক্তিময়ী এবং বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিতা এই অষ্টাদশভুজা (তবে বাঙালিরা দেবীকে দশভুজারূপে পূজা করেন অর্থাৎ অষ্টাদশ বাহুবিশিষ্টদুর্গার মূর্তি বাংলায় দেখা যায় না। তবে শাস্ত্রানুসারে দুর্গার বাহুর সংখ্যা হতে পারে চার, আট, দশ, ষোল, আঠারো বা কুড়ি) মহালক্ষ্মী রূপে মহিষাসুরকে বধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। রণসজ্জায় সজ্জিত দেবী দুর্গা ভয়ঙ্কর হুঙ্কার করেন। দেবী ও তাঁর বাহনের হুঙ্কারে ত্রিভুবন প্রকম্পিত হয়।

মহিষাসুর সেই প্রকম্পনে ভীত হয়ে প্রথমে তার সেনাদলের বীরযোদ্ধাদের পাঠাতে শুরু করে। দেবী ও তাঁর বাহন সিংহ প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করে একে একে সকল যোদ্ধা ও অসুরসেনাকে বিনষ্ট করেন। তখন মহিষাসুর নানা রূপ ধারণ করে দেবীকে ভীত বা বিমোহিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু দেবী সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। তখন মহিষাসুর অহংকারে মত্ত হয়ে প্রবল গর্জন করে। মহাশক্তিশালিনী দেবী তখন লাফ দিয়ে মহিষাসুরের উপর চড়ে তার কণ্ঠে পা দিয়ে শূলদ্বারা বক্ষ বিদীর্ণ করে মহিষাসুরের দর্প চূর্ণ করেন এবং তাকে বধ করেন। অসুরসেনারা হাহাকার করতে করতে পলায়ন করে এবং দেবতারা স্বর্গের অধিকার ফিরে পান। দেবী দুর্গা ন্যায় যুদ্ধে আসুরিক শক্তিকে বিনাশ করে সত্য, সুন্দর, কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করেন। দেবী দুর্গাকর্তৃক দুরাত্মা

মহিষাসুর নিধন বর্তমানে প্রচলিত দুর্গাপূজার দৃশ্যপট। মহিষাসুরকে বধ করেন বলে দুর্গা দেবীর এক নাম মহিষাসুরমর্দিনী (অসুরদলনী)।

দুর্গাপূজা বা দুর্গোৎসব হলো বাঙালির প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব। শরৎকালে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা এবং এ পূজা উপলক্ষে আয়োজিত উৎসব হচ্ছে শারদীয় দুর্গাপূজা বা শারদীয় দুর্গোৎসব। পক্ষান্তরে বসন্তকালে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা বাসন্তীপূজা নামে অভিহিত। বাসন্তীপূজা এখনও প্রচলিত থাকলেও শারদীয় দুর্গা পূজাই আবহমান কাল থেকে মহাসমারোহে উৎসবাকারে পালিত হচ্ছে। শারদীয় দুর্গাপূজার জনপ্রিয়তা বেশি। বাসন্তীপূজা মূলত কয়েকটি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আলোচ্য বিষয় হচ্ছে শারদীয় দুর্গাপূজার সর্বজনীনতা।

শরৎকালে অনুষ্ঠিত হয় বলেই দুর্গাপূজা শারদীয় দুর্গাপূজা বা শারদীয় দুর্গোৎসব নামে অভিহিত। আশ্বিন বা কার্তিক মাসে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে) এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। তবে সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত শারদীয় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই পাঁচটি তিথি যথাক্রমে দুর্গাষষ্ঠী, মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমী ও বিজয়াদশমী নামে পরিচিত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষকে বলা হয় দেবীপক্ষ। দেবীপক্ষের সূচনার অমাবস্যার নাম মহালয়া।

ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে দেবী দুর্গার পূজা করেন। কবি কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণে রাবণবধের জন্য রামকর্তৃক আয়োজিত এই শারদীয় দুর্গা পূজার পৌরাণিক কাহিনিটি উল্লিখিত হয়েছে। রাবণ দেবী দুর্গার আরাধনা করতেন। দেবী দুর্গা তাকে রক্ষা করতেন। তাই ব্রহ্মা রামকে দুর্গা দেবীর পূজা করার পরামর্শ দেন। রাবণকে বধ করার জন্য ব্রহ্মার পরামর্শে রাম শরৎকালে দেবী দুর্গার পূজা করেন। শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে দুর্গার বোধন, চণ্ডীপাঠ ও মহাপূজার আয়োজন করেন। আশ্বিন মাসের শুক্লা ষষ্ঠীর দিন রাম কল্পারম্ভ করেন। তারপর সন্ধ্যায় বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস করেন। মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী ও সন্ধিপূজার পরেও দুর্গার আবির্ভাব না ঘটায়, রাম ১০৮টি নীলপদ্ম দিয়ে মহানবমী পূজার পরিকল্পনা করেন। হনুমান তাঁকে ১০৮টি পদ্ম জোগাড় করে দেন। দুর্গা রামকে পরীক্ষা করার জন্য একটি পদ্ম লুকিয়ে রাখেন। একটি পদ্ম না পেয়ে রাম পদ্মের বদলে নিজের একটি চোখ উপড়ে দুর্গাকে নিবেদন করতে গেলে দেবী দুর্গা আবির্ভূত হয়ে রামকে কাঙ্ক্ষিত বর দেন এবং রাবণকে ত্যাগ করেন। দুর্গার বরে যুদ্ধে রাম রাবণকে বধ করতে সমর্থ হন।

দুর্গাপূজা বসন্তকালের উৎসব হলেও নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অকালে অর্থাৎ বসন্তকালের পরিবর্তে শরৎকালে শ্রীরামচন্দ্র দুর্গাপূজার আয়োজন করেন বলে শারদীয় দুর্গাপূজাকে অকালবোধন বা অকালপূজা বলা হয় (তবে কোনো কোনো মতে শরৎকালেই দুর্গাপূজার উৎপত্তি। বসন্তকালে দেবী পূজায় বোধনের কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ তখন দেবী জাগ্রত থাকেন)। শ্রাবণ মাস থেকে পৌষ মাস পর্যন্ত এই ছয় মাসকে বলা হয় দক্ষিণায়ন এবং মাঘ মাস থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত এই ছয় মাসকে বলা হয় উত্তরায়ণ। অতএব শরৎকাল হলো দেবতাদের দক্ষিণায়ন (রাত্রিকাল)। শরৎকাল দেবতাদের পূজার যথাযথ সময় নয়। অকালের পূজা বলে এই পূজার নাম অকালবোধন। শ্রীরামচন্দ্র অকালবোধনকালে যে মন্ত্র পাঠ করে দেবীকে জাগরিত করেন, যা দুর্গাপূজার মন্ত্র হিসেবে এখনও শারদীয় দুর্গাপূজায় অবশ্য পাঠ্য। তা হচ্ছে-

"রাবণস্য বিনাশায় রামস্যানুগৃহায় চ

অকালে বোধিতা দেবী।"

শারদীয় দুর্গোৎসব বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। অশুভ শক্তির বিনাশ এবং সত্য ও সুন্দরের আরাধনা শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অশুভ ও আসুরিক শক্তি দমনের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বিচার, সত্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা, সকল মানুষের সমানাধিকার নিশ্চিতকরণ, মানুষের মধ্যকার সকল প্রকার বৈষম্য বা ভেদাভেদ ও অন্যায়, অবিচার দূরীকরণ এবং অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, হানাহানিমুক্ত অসাম্প্রদায়িক মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সমাজগঠন করার শিক্ষালাভই দুর্গোৎসবের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

শারদীয় দুর্গোৎসব সমাজকে অসহিষ্ণুতা, হিংসা, বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত করে মানুষের মধ্যে ঐক্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠা করে। ঐক্যবদ্ধ করে সমগ্র বাঙালিকে। এক মায়াবী বন্ধনে জড়িয়ে রাখে সমস্ত বাঙালিকে। উদ্বুদ্ধ করে ভ্রাতৃবোধ ও সম্প্রীতি চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হতে। সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় করে। দুর্গোৎসবের শুভ্র ও আনন্দ জাগানিয়া পরশ শুধুমাত্র বাঙালি হিন্দু ধর্মানুসারীদেরই নয়, এর চিরায়ত ঐকতান স্পর্শ করে প্রতিটি বাঙালির হৃদয়কে। দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে যে অনাবিল আনন্দ সবার মনের মাঝে জেগে ওঠে তা বাঙালির প্রতিটি গৃহকে আলোকিত করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মঙ্গল ও হিতকামনায়।

সকল ধর্মের মূল বাণী হচ্ছে সৃষ্টির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা, সমগ্র জীবের কল্যাণ সাধনই ধর্মের মূল লক্ষ্য, কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধন নয়। এই চেতনাকে মনে-প্রাণে ধারণ করেই জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের সুখ-শান্তি কামনায় এবং সর্বজীবের মঙ্গলার্থে আবহমান কাল ধরে বাঙালি

হিন্দু সম্প্রদায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে নানা উপচার ও অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে পালন করে শারদীয় দুর্গোৎসব, আরাধনা করে দেবী দুর্গার। উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, ধনী-দরিদ্র, কৃষক-শ্রমিক, বালক-যুবক-বৃদ্ধ, শত্রু-মিত্র, অপরিচিত, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই (সর্বস্তরের মানুষ) নতুন সাজে আনন্দে এবং দুর্গোৎসবে প্রমত্ত হয়ে একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভাববিনিময় করে, উৎসবমুখরতার মধ্য দিয়ে একে অন্যেকে আপন করে নেয়।সকল প্রকার হীনতা, সংকীর্ণতা ও ধর্মান্ধতার উর্ধ্বে উঠে সকল প্রকার ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই চেতনাকে ধারণ করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণ শারদীয় দুর্গোৎসব উদ্‌যাপন করে এবং আনন্দ উৎসবে অংশগ্রহণ করে। সকল বাঙালি মিলিত হয় অভিন্ন মোহনায়, অভিন্ন চেতনায়। পূজার ধর্মীয় অংশটুকু হিন্দুদের; কিন্তু মেলা, উৎসব ও আপ্যায়নে অংশগ্রহণ এবং আনন্দ উপভোগ করেন সবাই। সকলের অংশগ্রহণ ও উপস্থিতিতে শারদীয় দুর্গাপূজা পরিণত হয় সর্বজনীন উৎসবে, পরিণত হয় সর্বস্তরের মানুষের (সকল ধর্মের) মিলনমেলায়, পরিণত হয় অন্যতম জাতীয় উৎসবে। ঐক্য ও সমন্বয়ের প্রতীক হিসেবে এ উৎসব পরিণত হয় সম্প্রীতিময় আনন্দযজ্ঞে। সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে উৎসবের আবহ এবং ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয় সকল মানুষের হৃদয়। পূজা থেকে উৎসবে রূপান্তরের এই যে প্রক্রিয়া, এটি বাঙালি জাতির অসাম্প্রদায়িক সত্তার নিরন্তন বহিঃপ্রকাশ।

উৎসব একার নয়। মিলনের মধ্যেই সত্যের প্রকাশ। সেই মিলনের মধ্যেই সত্যকে অনুভব করা উৎসবের সম্পূর্ণতা। এরূপ সর্বজনীন উৎসবের সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটে শারদীয় দুর্গোৎসবে। সকলের মঙ্গল ও হিতকামনায়, এমন বৃহত্তম আয়োজন খুবই গুরুত্ব বহন করে। পূজার সময় মন্দিরে মন্দিরে ভক্তিমূলক গান, চণ্ডীপাঠ, অর্চনা, আরতি, ভক্তদের শ্রদ্ধার্ঘ্য এবং সেই সাথে কোলাকুলি, প্রণাম, আশীর্বাদ, মেলা ইত্যাদি দুর্গোৎসবকে ধর্মীয় আবেশে আনন্দঘন করে তোলে। দুর্গোৎসব মানুষে মানুষে মেলবন্ধন সৃষ্টি করে। সৃষ্টি করে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতিময় ও কল্যাণময় সম্পর্ক। সমানাধিকার ও সমমর্যাদার সংগ্রাম সর্বস্তরে মূর্ত হয়ে ওঠে শারদীয় দুর্গোৎসবে। ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি দুর্গাপূজা সর্বস্তরের জনগণের মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও ঐক্য সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধর্মাচরণকে উপলক্ষ করে সর্বসাধারণের পার্থিব ও অপার্থিব সুখ কতভাবে যে এই সর্বজনীন উৎসবে সম্মিলিত হয়, তার পরিমাপ করা কঠিন। দুর্গাপূজা সর্বজনীন উৎসব এটা শুধু কথার কথা নয় - পূজা বিধিতেও তা লক্ষ করা যায়। দেবী দুর্গা মৃণ্ময়ী প্রতিমায় সপরিবারে পূজ্যপাদ। দুর্গার সঙ্গে সিদ্ধিদাতা গণেশ, মহাবীর দেবসেনা কার্তিক, ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মী ও বিদ্যার দেবী সরস্বতী পূজিত হন। দেবাদিদেব মহাদেবের স্থান থাকে সবার উপরে। দুর্গা দেবীর সঙ্গে তাঁর বাহন সিংহ, গণেশের বাহন ইঁদুর, কার্তিকের বাহন ময়ূর, লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা, সরস্বতীর বাহন হংস, এমন কি মহিষাসুরও পূজিত হন।

কুম্ভকার প্রতিমা গড়ে, পুরোহিত পূজা করেন, নাপিত দর্পণ দেয়, মালী ফুল সংগ্রহ করে, বাদ্যকার ঢাক বাজায়, ভুঁইমালী পূজার সময় নির্দেশ করে। উঁচু-নীচু-স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য সকলে একত্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে। পূজার পর শুভ বিজয়া। বিজয়ায় অবাধ মিলন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ একত্রে বিজয়ার উৎসব পালন করে। সকল বাধা ও মনের সংকীর্ণতা দূর করে অনৈক্য-বিভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক মনোভাব দূরে ঠেলে মানুষে মানুষে সমাবেশ ঘটে পূজার উৎসবস্থলে। সকলের সহাবস্থান আর ঐক্যের মেলায় পরিণত হয় পূজার মন্দির। প্রকাশিত হয় বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনা। দুর্গাপূজা আক্ষরিক অর্থেই সর্বজনীন নয়, এর রয়েছে ব্যাপক ও সুস্থ সামাজিক প্রভাব। যা একান্তই চিরন্তন ও স্বতঃস্ফূর্ত। এ জন্যই শারদীয় দুর্গাপূজা সামাজিক সম্প্রীতি, মহামিলন এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার চিরন্তন সর্বজনীন উৎসব।

শারদীয় দুর্গোৎসব হোক আনন্দময় ও উৎসবমুখর এবং সত্য ও সুন্দরের আলোকে আলোকিত হোক প্রত্যেকের জীবন। শারদীয় দুর্গোৎসবের মাধ্যমে সকল হীনতা, সংকীর্নতা, ধর্মান্ধতা, অজ্ঞানতা, দূরীভূত হোক এবং অন্তরের পশুত্ব ও আসুরিক শক্তির বিনাশ হোক, বিনাশ হোক সকল অশুভ শক্তির, জেগে উঠুক মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ, রচিত হোক সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও মহামিলনের সেতুবন্ধন, নির্মল হোক সকলের চিত্ত, সার্থক হোক শক্তি-সংহতি-কল্যাণ অন্বেষা, বিশ্ব থেকে চিরতরে ধ্বংস হোক আসুরিক প্রবৃত্তি, ধরণীতে নেমে আসুক শান্তির ধারা, বিশ্বমানবতার জয় হোক, সর্বস্তরের মানুষ জাত-পাতের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে দেশ ও সমগ্র জাতির কল্যাণে ব্রতী হোক। হিংস্র সাম্প্রদায়িক শক্তির বিনাশ ঘটে নবচেতনায় গড়ে উঠুক ধন-ধান্যে পুষ্পভরা আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ।

অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান, সংস্কৃত বিভাগ; ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট; উপদেষ্টা, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র; সিনেট সদস্য ও সাবেক প্রাধ্যক্ষ, জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শারদীয় দুর্গাপূজা

সঞ্জীব কুমার সাহা

"বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ"। তার মধ্যে অন্যতম হল বাঙালির 'দুর্গোৎসব'। কাশ বনের দোলায় দেবীপক্ষের সূচনা বাঙালির মনকে আলোড়িত করে। বাঙালির দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান ঘটে মহালয়ার শুভ বন্দনাতে। শরৎ-এর মেঘ আর শিউলির গন্ধ দশভুজার আগমনকে উন্মুক্ত চিত্তে স্বাগত জানায়। বাঙালির জীবনে দুর্গোৎসবের এই আনন্দকে তুলে ধরা হলো।

বাঙালি চিরকালই উৎসবপ্রেমী জাতি। লোকমুখে প্রচলিত "বাংলার মানুষের বারো মাসে তেরো পার্বণ" কথাটি মোটেই অত্যুক্তি নয়। সারা বছর জুড়েই বাঙালির জীবন নানা প্রকার উৎসবের আলোয় মুখরিত হয়ে থাকে। তবে এতসব উৎসবের মধ্যেও যেটি বাঙালির কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় এবং অন্তরের উৎসব তথা বাঙালি জাতির সর্বজনীন, তা হল শরৎকালের দুর্গোৎসব।

বলা যায় বাঙালি জাতির সমগ্র প্রাণ এই পূজার মধ্যে নিহিত থাকে। বর্ষার কালো মেঘ সরিয়ে শরতের রোদ্দুর উঁকি দিলেই বাঙালির মন হিসেব কষতে শুরু করে দেয় মা দুর্গার আগমনের আর কতদিন বাকি। প্রতিদিনকার পরিচিত গতানুগতিক জীবনে ব্যস্ত বাঙালি গোটা একটা বছর শত উৎসবের মধ্যেও অধীরভাবে প্রতীক্ষা করে থাকে এই মহোৎসবের জন্য।

শরৎকালে এই উৎসব হয় বলে এটি শারদোৎসব নামেও পরিচিত। ধনী-গরীব, নর-নারী, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে সকল মানুষের মিলনের এমন সর্বজনীন ভাবটি অন্য আর কোনো উৎসবে সেভাবে দেখা যায়না। সমগ্র দেশ তথা পৃথিবীর কাছে বাঙালি জাতির এই দুর্গাপূজার রূপ অভাবনীয় এবং অভিনব।

দুর্গাপূজা কবে, কখন, কোথায় প্রথম শুরু হয়েছিল তা ঠিক করে বলা যায় না। দুর্গাপূজার ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। হিন্দু পুরাণে দুর্গাপূজার সূচনা সম্পর্কে বিভিন্ন কাহিনী পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও কথিত আছে, পুরাকালে রাজা সুরথ তার হারিয়ে যাওয়া রাজ্য ফিরে পাওয়ার জন্য দেবী দুর্গার পূজা করেন। তখন এই পূজা হতো বসন্ত কালে। সেজন্য এই পূজাকে বাসন্তী পূজা বলা হত।

অন্যদিকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুসারে শ্রী রামচন্দ্র শরৎকালে সীতা উদ্ধারের নিমিত্ত লঙ্কাধিপতি রাবণের সাথে যুদ্ধের পূর্বে ১০৮টি নীল পদ্ম সহযোগে দেবী দুর্গার পূজার আয়োজন করেছিলেন। শরৎকাল দেবতাদের নিদ্রাকালীন সময় হিসেবে শাস্ত্রে বিবেচিত হওয়ার কারণে শ্রী রামচন্দ্রের আয়োজিত এই পূজাকে অকালবোধন বলা হয়ে থাকে। তা ছাড়া এই পূজাটি সম্পর্কে হিন্দুদের বিভিন্ন শাস্ত্র যেমন, দেবীভাগবত পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, দেবীমাহাত্ম্যম ইত্যাদি স্থানে নানা প্রকার কাহিনীর উল্লেখ আছে।

যাইহোক ভারতীয় উপমহাদেশে সেই প্রাচীন যুগ থেকে নানারূপে দেবী দুর্গার আরাধনা হয়ে আসছে। বাঙালিরা এরমধ্যে মূলত কৃত্তিবাসী রামায়ণ বর্ণিত শ্রী রামচন্দ্রের অকালবোধনকেই নিজেদের শারদোৎসব হিসেবে বেছে নিয়েছে।

এই দুর্গোৎসবের পটভূমি অপূর্ব সুন্দর। ঘননীলমেঘশ্যামা বর্ষা বিদায় নেওয়ার পর বৃষ্টি ধোয়া নীলাকাশ সোনালি রোদ্দুরের আলপনায় সেজে উঠতে থাকে। শিশির ভেজা দূর্বা ঘাসে ঝরে পড়া মুঠো মুঠো শিউলি ফুলের মাতাল করা গন্ধে মেতে ওঠে মন প্রাণ। শরতের তুলোর মতো সাদা কাশফুলে ভরে ওঠে বাংলার মাঠ-ঘাট, নদী প্রান্তর।

দুর্গা মায়ের আগমনের বাণী ঘোষণা করেই যেনো প্রকৃতি সেজে ওঠে এক অভিনব সজ্জায়। কোন এক প্রাচীন যুগে হয়ত এমনই মনোরম পরিবেশে সকল বিপত্তির অবসানের উদ্দেশ্যে শরৎকালে দেবী দুর্গার অকালবোধনের আয়োজন করেছিলেন শ্রী রামচন্দ্র। বাঙালি প্রতি শরৎ ঋতুতে মা দুর্গার বোধন করে সেই ঐতিহ্যকে আজও বহন করে নিয়ে চলেছে।

সমগ্র উপমহাদেশজুড়ে প্রচলিত হলেও বাঙালির কাছে দুর্গাপূজার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক তথা সামাজিক গুরুত্ব অনেকটাই আলাদা। শাস্ত্রীয় দুর্গাপূজা বাঙালির কাছে প্রাণের প্রিয় শারদ উৎসব। সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে বাঙালির এই উৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে। সেই শুক্লপক্ষের ষষ্ঠ থেকে দশম দিন পর্যন্ত দেবীর আরাধনা চলে।

এই পাঁচ দিন দুর্গা ষষ্ঠী নামে পরিচিত। এই সংশ্লিষ্ট পক্ষটির অপর নাম হল দেবীপক্ষ। পিতৃপক্ষের অবসানে অমাবস্যায় মহালয়ার মধ্যে দিয়ে দেবীপক্ষের সূচনা ঘটে। মহালয়ার এই পবিত্র দিনটিতে মানুষ তাদের পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করে থাকেন। অন্যদিকে দেবীপক্ষের সমাপ্তি কোজাগরী পূর্ণিমার পূণ্য চন্দ্রের পবিত্র আলোকে দেবী লক্ষ্মীর আরাধনার মধ্য দিয়ে। বিশ্বজুড়ে সকল বাঙালিদের কাছে এই শারোদৎসব অত্যন্ত কাছের।

বাঙালিরা যে যেখানেই থাকুক না কেন এই উৎসবকে কেন্দ্র করে সকলেই আনন্দে মেতে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ইংল্যান্ডের নানা শহরেও বসবাসকারী প্রবাসী বাঙালিদের আয়োজিত দুর্গাপূজাগুলি বিশ্বজুড়ে আলোচনার শীর্ষে থাকে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশে দুর্গোৎসব উপলক্ষে সরকারি ছুটি দেওয়া হয়ে থাকে।

দেবীপক্ষের পুণ্য তিথিতে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী- এই তিনদিন মহা সাড়ম্বরে দেবী দুর্গা পূজিত হয়ে থাকেন। তবে সর্বাগ্রে মহাষষ্ঠীর দিন পৌরাণিক রীতি মেনে দেবী দুর্গার বোধন হয়।

এ কেবল দেবী দুর্গার একার পূজা নয়। দেবীদুর্গার পূজা উপলক্ষে আরও অনেক দেব-দেবীর পূজা করা হয়। সব নারীর মধ্যেই দেবী দুর্গা বিরাজ করে এমন বিশ্বাসের কারণে মহা অষ্টমীর দিন কুমারী পূজার আয়োজন করা হয়ে থাকে। অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিস্থলে আয়োজিত হয় সন্ধিপূজা। সবশেষে আসে দশমীর দিনের পূজার লগ্ন। এটি সুপরিচিত বিজয় দশমী নামে।

এই উৎসব শুধু পুজোতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সম্প্রতি সর্বজনীন পূজাগুলির মধ্যে শুরু হয়েছে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা। সব মিলিয়ে নানান রকমের বিশাল প্যান্ডেল, থিম, আকর্ষণীয় লাইট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সংকলন প্রকাশ সব মিলিয়ে পুজোর এই কয়েকটা দিন বাঙালির হৃদয় ও মনকে এক পরিছন্ন আনন্দে উদ্ভাসিত করে তোলে।

শারদ উৎসবকে কেন্দ্র করে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্ধারিত হয়ে থাকে। উৎসব আয়োজনের সূচনা লগ্ন থেকে বিভিন্ন পূজাস্থলে মণ্ডপ তৈরির কাজে নিয়োগ পান হাজার হাজার শিল্পী, কারিগর ও শ্রমিকেরা।

অন্যদিকে পূজা শুরুর বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই শহরের বুকে ঢল নামে ঢাকিদের। এইসকল ঢাকিরা পূজার দিনগুলিকে ঢাক-ঢোল, কাঁসরঘণ্টার আওয়াজে মুখরিত করে রাখেন। তাছাড়া দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করেন। সর্বোপরি উল্লেখ করতে হয় সেই সকল কারিগর ও শিল্পীদের কথা যাদের হাতে দেবীর মূর্তি প্রাণ পায়।

এই সকল মূর্তিশিল্পী ও কারিগরেরা কোন অংশেই বড় বড় ভাস্করদের থেকে কম নন। যদিও সমাজে সারাবছর তাদের সমান সমাদর নেই বলেই বোধ হয়। যাই হোক, মূলকথা হলো এত বিপুলসংখ্যক মানুষের জীবন ও জীবিকা আবর্তিত হয় বাঙালির শারোদৎসবকে কেন্দ্র করে। এই সকল মানুষেরা মূলত দুর্গোৎসবের এই দিন কয়েকের জন্যই সারা বছর অপেক্ষা করে থাকেন।

উৎসবের দুটি দিক; একটি ব্যাক্তির, আর অন্যটি হল সমষ্টির। দুর্গা পুজোয় মূলত আমাদের সার্বিকভাবে চোখে পড়ে সমষ্টির সমাবেশ। কিন্তু ব্যাক্তি মানুষ সাড়া না দিলে সমষ্টির উৎসব ম্লান হয়ে যায়। তাই ব্যাক্তির গুরুত্ব এখানে সর্বাধিক। ব্যাক্তিগত জীবনে কেউ হিন্দু, কেউ মুসলিম, কেউ শিখ, কেউ বা ধর্মে বিশ্বাসী নয়; আবার কেউ ধনী, কেউ বা দরিদ্র-এই সকল প্রকার ভেদাভেদ দূরে সরিয়ে সবাই মিলেমিশে পরম আনন্দে আমরা এই উৎসবে মেতে উঠি। আর এখানেই বাঙালির দুর্গাপূজার সার্থকতা।

লেখক: উপদেষ্টা, তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ।

শারদীয় দুর্গাপূজা : অসাম্প্রদায়িক চেতনার উৎসব

ড. নিখিল চন্দ্র সরকার

শারদীয় দুর্গাপুজা বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান পূজা ও উৎসব। ধর্মীয় উপাচার ব্যতীত উৎসবটি কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, আবহমান বাংলার ঐতিহ্যের অঙ্গীকার এটি এখন সবার উৎসবে পরিগণিত হয়েছে। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই উৎসব প্রীতিবন্ধনের অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করে থাকে। আমাদের স্লোগান, "র্ধম যার যার, উৎসব সবার"। পাঁচ দিনব্যাপী দুর্গাপূজার আনন্দ ভাগাভাগি করে আমরা প্রীতিময় ভালোবাসায় একাকার হয়ে যাই। সবার মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়ে যায় । দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গা সত্যি আমাদেরকে তাঁর যজ্ঞকর্ম মূহুর্তে সবার দূর্গতি নাশ করে অভিন্ন চেতনায় ঐক্যবব্ধ করে তোলেন।

দুর্গাপূজা সমগ্র বাঙালি জাতির চিরায়ত ঐতিহ্য ও ধর্মীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধনে অনুপম প্রীতিময় আনন্দ উৎসব। অশুভশক্তির পরাজয় ও শুভশক্তির জয়, সত্য ও সুন্দরের আরাধনায় সকল জীবের মঙ্গল কামনায় শারদীয় দুর্গাপূজা সকলে মিলে-মিশে উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হয়ে থাকে। সমাজে অশুভ ও আসুরিক শক্তি দমনের মাধ্যমে ন্যায়বিচার, সত্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা, সকল মানুষের মধ্যকার সকল প্রকার বৈষম্য বা ভেদাবেদ ও অন্যায়, অবিচার দূরীকরণ, অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও অসাম্প্রদায়িক মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে সমাজ গঠন করার শিক্ষালাভই দুর্গাপূজার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

ধর্ম ও উপচার নিষ্পৃহতায় বয়ে আনে সকলের মাঝে শান্তি। বিশ্বমানব বিশ্বসভায় আশ্রিত। তিনিই সত্যস্বরূপা। চিত্র সরস না হলে রসাস্বাদন করা যায় না। সবার কল্যাণ ও সুখের আধার দেবী দুর্গা পূজিত হবেন ভক্তের কাছে। বাঙালি সনাতন সম্প্রদায় দেবীর পূজা করে থাকেন। দেবী দুর্গা হচ্ছেন আলোকে উদ্ভাসিত মহামায়ার এক অবয়ব। স্বর্গ হচ্ছে আলোকময় রাজ্য। কিন্তু অসুরের জন্য অন্ধকার। আলো-আঁধার হচ্ছে

মানুষের আবাসস্থল। আলোর অধিবাসী দেবতা। মানবজাতি সেই আলো-আঁধার থেকে আলোর রাজ্যে প্রবেশ করতে চায়।

দেবী দুর্গা জড়জগতের মোহকে অতিক্রম করে ভাবের জগৎকে প্রশস্ত করে তোলেন । এটা কেবলেই হিন্দুধর্মীয় অনুশাসন নয়, গোটা মানবজাতিকে জ্যোতির্ময়তায় ভরিয়ে দেয়। প্রাচীনকাল থেকে বৈদিক দর্শনের নিমিত্তে উপসনায় শক্তির আরাধনা করা হয়। বেদে যেমন শক্তির আরাধনা, তেমনি তন্ত্রে বা আগম শাস্ত্রে সর্বত্র শক্তির উপাসনায় প্রাবল্য। শক্তি সাধনার ধারায় তন্ত্রে বেশ পরিব্যাপ্ত। বৈদিক ঋষিরা শক্তিকে প্রত্যক্ষ করেছেন সর্বত্র প্রাকৃতিক নানা অভিব্যক্তির মধ্যে। আবার অন্যান্য ধর্মেও ধর্মবেত্তরা পরম সৃষ্টিকর্তাকে অনন্য অভিব্যক্তিতে প্রত্যক্ষ করার চেষ্ঠা করে থাকেন। তান্ত্রিক সাধকেরা মহাশক্তিকে নিজের মধ্যে তাঁর স্বরূপ রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং নিবিষ্টচিত্তে তাঁর অর্চনায় রত থেকেছেন। শক্তির সাধনা তিন ভাগে বিভক্ত–ইচ্ছে, জ্ঞান ও ক্রিয়া। পৃথিবীতে সব ধর্মের মানুষেই শক্তির প্রার্থনা করেন ভিন্ন ভিন্ন আচারে। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি এক ও অভিন্ন। এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে যাঁরা বিশ্লেষণে অভ্যস্ত, তাঁদের মধ্যে কখনো হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হতে পারে না।

শাস্ত্রমতে, অশুভ শক্তির প্রতীক মহিষাসুর ধ্যানে সিদ্ধিলাভ করে ব্রহ্মার নিকট অমরত্বের 'বর' প্রার্থনা করলে ব্রহ্মা তা প্রত্যাখান করেন। কিন্তু নাছোড়বান্দা অসুরের পীড়াপীড়িতে 'বর' দেন, 'কোন পুরুষ অসুরকে বধ করতে পারবে না'। এই 'বর' পেয়ে অসুর স্বমূর্তি ধারণ করে স্বর্গরাজ্য থেকে দেবতাদের বিতাড়িত করতে উদ্যত হলে দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণুর নির্দেশে সব দেবতার তেজঃপুঞ্জ থেকে এক দেবীর জন্ম হয়। তিনি দশবুজা মা দুর্গা। দশবুজা অর্থাৎ দুর্গার দশটি হাত। দেবতাদের দেওয়া অস্ত্রে প্রতিটি হাত সুসজ্জিত এবং তা দিয়েই মা দুর্গার অশুভ শক্তির প্রতীক অসুর বধ করে ধরাধামে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এটাই সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস ও দুর্গাপুজার মাহাত্ম্য।

বাংলায় দুর্গাপূজার প্রবর্তন কে কবে করেছিলেন, সে সম্পর্কে কিছুই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। সাধারণভাবে মনে করা হয়, অধুনা বাংলাদেশের তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ প্রথম দুর্গাপূজা করেন। কংসনারায়ণ দুর্গাপূজা করেছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর শেষলগ্নে কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনায়। কিন্তু তারও আগেকার সাহিত্য ও অন্যান্য সূত্রে বাংলায় দুর্গাপুজার উল্লেখ পাওয়া যায়। খুব সম্ভবত, আট মতান্তরে নয় লাখ টাকা ব্যয়ে কংসনারায়ণ দুর্গাপূজা করেন, তাই সে যুগের মানুষের মাঝে দুর্গোপুজার সংজ্ঞা বদলে দিয়েছিল।

ভারতবর্ষে কবে থেকে দুর্গাপূজা পালিত হয় তার শুদ্ধ তারিখ নির্ণয় করা কঠিন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর পণ্ডিতরা ধারনা করেন বর্মন সেন শাসনামল (১১-১৩ শতক) থেকে বঙ্গদেশে দুর্গাপুজার প্রচলন শুরু হয়।

বর্তমানকালে দেবী দুর্গাকে দশ হাত সংবলিত দেখি। প্রতিটি হাতে অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত। মা দুর্গার পায়ের কাছে রয়েছে তাঁর বাহন সিংহ। মহিষাসুরের বুকে বিদ্ধ দেবীর ত্রিশূল অসুর দানবের পায়ের নীচে তার বাহন মহিষ। মা দুর্গার ডান পাশে পুত্র গণেশ ও দেবী লক্ষ্মী এবং বাঁ পাশে পুত্র কার্তিক ও দেবী সরস্বতী। শাস্ত্রবিদরা বলেন, প্রতিটি প্রতিমার আছে প্রতীকী রূপ। যেমন দুর্গা হলো ধর্ম ও কল্যাণের প্রতীক, মহিষাসুর অধর্ম ও অকল্যাণের, গণেশ সিদ্ধিদাতা, লক্ষ্মী ঐশ্বর্যের, কার্তিক বীরত্বের আর সরস্বতী জ্ঞানবিদ্যার প্রতীক। বাংলায় যে দুর্গোপূজা প্রচলিত, তা মূলত মহিষাসুরমর্দিনীর পূজা। মহিষাসুরমর্দিনীর পূজার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ব্রক্ষবৈবর্ত পুরাণ-এ (রচনাকাল আনুমানিক অষ্টম শাতাব্দী)। এছাড়া দুর্গাপুজার কথা পাওয়া যায় মার্কণ্ডেয় পুরাণ (মূল পুরাণটি চতুর্থ শতাব্দীর রচনা, তবে দুর্গাপুজার বিবরণ সংবদিত সপ্তশতী চণ্ডী অংশটি পরবর্তীকালের সংযোজন), বৃহন্দীকেশ্বর পুরাণ (সঠিক রচনাকাল অজ্ঞাত), কালিকা পুরাণ (রচনাকাল নবম-দশম শতাব্দী) ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণ-এ (রচনাকাল ১২শ শতাব্দী)। ৯ম থেকে ১২শ শতাব্দীর মধ্যকার সময়ে নির্মিত একাধিক মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি বাংলার নানা স্থান থেকে আবিস্কৃত হয়েছে।

আমাদের বাংলাদেশ সাম্য-সম্প্রীতির ঐতিহ্যে মহীয়ান প্রিয় জন্মভূমি । এ সাম্য-শান্তির বাণী নিয়ে যুগে যুগে মর্তধামে আগমন অসুর বিনাশিনী "শক্তিরূপেন" দেবী দুর্গার। মা মহামায়ার আবির্ভাব সব অশুচি, সব জড়তা, সব মহামারি নির্মূল করে শক্তিরূপে অধিষ্ঠিত হওয়া। তাই তো মন্দিরে চলছে চিরায়ত সত্য-সুন্দর। স্তোত্রপাঠঃ যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্তিতা। নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমঃ নমঃ। শক্তি শব্দটি স্ত্রীবাচক। শাস্ত্র ও পুরাণমতে নারীমূর্তিকে মাতৃরূপে আরাধনা ও উপাসনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি নারী বা পুরুষ নন, মহাশক্তি। আর নেই মহাশক্তির অংশরূপিণী দেবী দুর্গা বিভিন্ন নামে আমার কাছে আরাধ্য। দুর্গা, বাসন্তি, উমা, পার্বতী, চণ্ডী, কাত্যয়ানীসহ অনেক বিভিন্ন রূপও নামে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। চণ্ডী থেকে জানা য়ায় অসুর কর্তৃক সৃষ্টি ধ্বংসের এক ক্রান্তিকালে দেবী দুর্গার আবির্ভাব। ঘটনাটি এ রকম মহিষাসুর ব্রক্ষার বরপ্রাপ্ত হয়ে যুদ্ধে স্বর্গরাজ

ইন্দ্রকে পরাজিত করে। এরপর সব দেবতাকে তাড়িয়ে দিয়ে স্বর্গে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করল অসুররা। দেবতারা মর্তে এসেও স্বস্তি পাননি। মহিষাসুর এখানেও তাদের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতন চালাতে লাগল। তখন নিরুপায়-বিপন্ন দেবতারা অসুরের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহামায়াকে স্মরণ করেন। মহামায়ার নির্দেশমতো ঐক্যবদ্ধ দেবতারা নিজ নিজ তেজোরশ্মির সম্মিলন ঘটালে অকস্মাৎ সেই তেজোরশ্মি থেকে দুর্গার জন্ম। মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন বলেই তার নাম হয় মহিষাসুর মর্দিনী। সেই অসুরের কবল থেকে দূর্গত দেবতাদের দুর্গতি দূর করে তিনি হয়েছেন দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গা। দেবীর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতাঙ্গ তেজপুঞ্জের প্রভাব পড়েছে এভাবে- শিবের তেজে দেবীর মুখ, বিষ্ণুর তেজে বাহু, চন্দ্রের তেজে দুটি স্তন, যমের তেজে কেশ, ইন্দ্রের তেজে মধ্যভাগ, করুণের তেজে উরু, পৃথিবীর তেজে নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে পদযুগল। এরই সঙ্গে মহাদেব দিলেন শূল, কৃষ্ণ দিলেন চক্র, শঙ্খ দিলেন বরুণ ও অগ্নি দিলেন মুক্তি।

শুক্লা ষষ্ঠী থেকে মহানবমী পর্যন্ত পূজা। তারপর বিজয়া দশমীতে দেবী বিসর্জন। অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিতে বিশেষ যে পুজা তার নাম সন্ধিপূজা। কোন কুমারী মেয়েকে ডেকে এনে পুজা করা হয় যার নাম কুমারী পূজা। মহাসপ্তমীর দিন দেবীর সঙ্গে তার প্রতীকরূপে কলাবউ পূজিতা হন, যার শাস্ত্রীয় নাম নবপত্রিকা। নবপত্রিকা হলো নয়টি গাছের সমন্বিত রূপ। কদলী, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তি, বেল, ডালিম, অশোক, মান ও ধান-এ নয়টি গাছের চারাকে শ্বেত অপরাজিতার লতা দ্বারা বেষ্টন করে কলাবউ সাজানো হয়। সমষ্টিগতভাবে মা দুর্গার প্রতিনিধিরূপ এদের অর্চনা করা হয়। নবপত্রিকা উদ্ভিদ জগতের প্রতিনিধি। আবার দুর্গা দেবীও উদ্ভিদ জগতের প্রতিষ্ঠাত্রী দেবী।

বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের বারো মাসে তেরো পার্বণের প্রধান ধর্মীয় পার্বণ শারদীয় দুর্গাপূজা। এ বছর ২০ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর-এ পাঁচ দিন দূর্গাপুজা। প্রতিটি পূজামণ্ডপের সব আয়োজন প্রায় শেষ পর্যায়ে। প্রতিমা শিল্পীরা তুলির শেষ আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন তার প্রতিমাটি। চারদিকে সাজসাজ রব। এটি কেবল পূজা মণ্ডপকে ঘিরে আয়েজকদের মাঝে তা কিন্তু নয়। ঈদের বাজারের মতোই দোকানে দোকানে ঝুলছে ‘পূজার বাজার’ লেখা নানা রং-বেরঙের ব্যানার-ফেস্টুন। চটকদার বিজ্ঞাপন কেবল পথে-ঘাটেই নয়, মুহূর্তে মুহূর্তে আসছে মোবাইলে, ফেসবুকে, ই-মেইলে ও নানা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবার কাছেই জানান দিচ্ছে দুর্গোৎসবের আগমনি বার্তা। দুর্গাপূজা রাজসিক। একসময় রাজা, জমিদার, সচ্ছল বিত্তবান পরিবারের মধ্যেই কেবল দুর্গাপূজার প্রচলন ছিল। আয়োজকও ছিলেন তারাই। পাঁচ দিনের পূজা, উৎসব চলত মাসব্যাপী। দশ গ্রাম থেকে আত্মীয়-স্বজন এসে জড়ো হতেন পূজা বাড়িতে কিংবা পূজা বাড়ির আশেপাশের বাড়িতে। মা দুর্গার সন্ধ্যা-আরতির পর শুরু হতো গানবাজনা, উচ্ছাঙ্গ সংগিতের আসর, যাত্রাপালা, কবিগান আরও কত কী? আর্থিক কারণেই পরবর্তী সময়ে বারোয়ারি পূজা এবং আজকের সর্বজনীন পূজা। সবাই মিলে চাঁদা তুলে দূর্গাপুজার আয়োজন। এ সবাই মিলে চাঁদা-বিষয়টি কিন্তু আজ আর কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। অন্য সম্প্রদায়ও সানুগ্রহে দুর্গোৎসবে আর্থিক সহায়তা করে চাঁদা দিয়ে, পূজা উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা ও পূজাঙ্গন সজ্জায় বিজ্ঞাপন দিয়ে স্পন্সর করে। ছোট ছোট ব্যবসায়ীও পিছিয়ে থাকেন না। পূজাঙ্গনের আশেপাশে মেলায় বা অস্থায়ী দোকান দিয়ে নানা ধরনের ঐতিহ্যবাহী খাবার ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসেন তারা। এসকল কর্মকাণ্ডে প্রমাণিত হয় দুর্গোৎসব সর্বজনীন।

দুর্গাপূজার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সনাতন ধর্মাবলম্বীদের তবে মূলবাণী সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে নিবেদিত যাতে জড়িয়ে আছে বাঙালির হাজার বছরের অসাম্প্রদায়িক চেতনা। দুর্গোৎসব সকল ধর্মের মানুষের মাঝে এক সামাজিক বন্ধন ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার উৎস হিসেবে এবং ভ্রাতৃত্ববোধের এক নতুন আবহ তৈরি করে থাকে। মা দুর্গা দেবীর যুদ্ধরতরূপ মানবজাতির শিক্ষার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। যা অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির যুদ্ধ এবং অন্যায়, অসত্য ও অনাচারের বিরুদ্ধে ন্যায়, সত্য ও সদাচারের সংগ্রাম। দুর্গা দেবীর আরাধনার প্রেক্ষাপট হলো অন্তরের আসুরিক শক্তির বিনাশ। এ পূজা হচ্ছে শক্তি ও ঐশ্বরিক শক্তির আরাধনা। মা দুর্গার ‘দশ হাত’ ঐক্য ও সমৃদ্ধির সম্মিলিত শক্তির প্রতীক। অপরদিকে বাঙালি জাতির জীবনে শারদীয় দুর্গোৎসব অসাম্প্রদায়িক চেতনা শক্তির প্রতিরূপ। যেখানে থাকে না কোনো ভেদাভেদ, থাকে না সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প। দুর্গোৎসবের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি যে অসাম্প্রদায়িক জাতি হিসেবে সারা বিশ্বের নিকট প্রতিবছরই প্রমাণিত হয়। এটি বাঙালি জাতির ঐতিহ্য ও গর্বের বিষয়। সত্যিকার অর্থে দুর্গোৎসব বাঙালি জাতির মহামিলনধর্মী অসম্প্রাদায়িক উৎসব।

লেখক: উপদেষ্টা, তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ।

মণ্ডপে নয়, নেপালের ঘরে ঘরে পূজিতা হন দুর্গা ভবানী

প্রদীপ কুমার সাহা

পূর্ব হিমালয়ের কোলে অবস্থিত নয়নাভিরাম দেশ নেপাল। দেশটির মাথার শ্বেতশুভ্র মুকুট হয়ে বিরাজ করছে মাউন্ট এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা, লোৎসে, মাকালু, অন্নপূর্ণা, ধৌলাগিরির মতো বিশ্ববিদিত শৃঙ্গের দল। পশুপতি পুরাণ থেকে জানা যায় 'নে' নামের এক সাধু নেপালে এসেছিলেন ধর্মপ্রচার করতে। বাগমতী ও বিষ্ণুমতী (মতান্তরে কেশাবতী) নদীর সঙ্গমে তিনি বসেছিলেন তপস্যায়। তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল উপত্যকাবাসী। সেই 'নে' মুনির নামানুসারেই দেশটির নাম হয়েছে নেপাল।

নেপাল নামটির উৎস নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেন অনেক ইতিহাসবিদ। তাঁরা মনে করেন, তিব্বতি শব্দ 'নিয়ামপাল' থেকে এসেছে 'নেপাল' নামটি। 'নিয়ামপাল' শব্দটির অর্থ পবিত্র ভূমি। নেপাল যে পবিত্র ভূমি, তা নিয়ে অবশ্য কোনও দ্বিমত নেই। কারণ হিন্দুপুরাণ অনুসারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর হরিণের রূপ ধারণ করে এসেছিলেন নেপালে। ভগবান বুদ্ধের পদস্পর্শেও পবিত্র হয়েছে নেপাল।

নেপালের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে হিন্দু সংস্কৃতি

নেপাল বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। তবুও দেশটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে হিন্দু সংস্কৃতি। কারণ দেশটির ৮১ শতাংশ জনগণই হিন্দু ধর্মাবলম্বী। প্রাচীন হিন্দু সৌর পঞ্জিকা 'বিক্রম সম্ভাত' অনুসারে দেশটি চলে। নেপালের জনগণ বিশ্বাস করেন, অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় দেবাদিদেব মহাদেব ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে দিয়েছিলেন একটি রণপতাকা। যে পতাকায় আঁকা ছিল সূর্য ও চন্দ্র। দেবরাজ ইন্দ্র রণপতাকাটি দান করেছিলেন নেপালবাসীদের। দেবতাদের দেওয়া সেই রণপতাকাই আজ নেপালের জাতীয় পতাকা। হিন্দু ধর্মের সকল দেবদেবী পুজা পান নেপালে। এছাড়াও পুজা পান নেপালের পাহাড়ি এলাকার লৌকিক দেবদেবীরা। হিন্দু ও বৌদ্ধদের পুজা পান সাধক মচ্ছেন্দ্রনাথ বা বুঙ্গা দাই। তবে সবার ওপরে অবস্থান শ্রীবিষ্ণু, মহাদেব, দেবী ভবানী, মা কালী ও মা তারার। নেপালের বেশিরভাগ মন্দিরেই বিরাজ করেন এই দেবদেবীরা। এঁদের বিখ্যাত মন্দিরগুলি হল পশুপতিনাথ, দোলেশ্বর মহাদেব, মুক্তিনাথ, ছাঙ্গুনারায়ণ, বুড়া নীলকণ্ঠ, গুহ্যেশ্বরী শক্তিপীঠ, দক্ষিণাকালী মন্দির ও মনোকামনা মন্দির।

ভারতীয় হিন্দুদের মতোই নেপালের হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাও পালন করেন হিন্দু ধর্মের প্রায় সমস্ত আচার অনুষ্ঠান। এছাড়াও তাঁরা পালন করেন নিজস্ব কিছু ধমীয় উৎসব, সেগুলির মধ্যে আছে ইন্দ্রযাত্রা, ঘোড়ে যাত্রা, ভৈরব কুমারী যাত্রা, গাই যাত্রা, বাঘ যাত্রা, রাতো মচ্ছেন্দ্রনাথ যাত্রা, মা যাত্রা, তানসেন যাত্রা, জনাই পূর্ণিমা, ফাগু পূর্ণিমা, মাতা তীর্থ আউনসি, গোকারণ আউনসি, ঘণ্টাকর্ণ চতুর্দশী ও আরও অসংখ্য উৎসব। তবে নেপালের উৎসবগুলির মধ্যে সেরার সেরা উৎসব হল আশ্বিনের 'বড়া দশেইন' উৎসব। নেপাল বিশ্বাস করে, এই উৎসব নেপালের জনজীবনে সুখ, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, শক্তি, সৌভাগ্য, সম্পদ, সুস্বাস্থ্য, গতি ও গৌরব নিয়ে আসে। নাগরিকদের ও দেশের সকল শত্রু বিনাশ করে।

শরতের নীল আকাশ মাতিয়ে তোলে নেপালকেও

নীল আকাশে ভেসে আসা দুধসাদা মেঘ নিয়ে আসে দেবী দুর্গা ভবানীর আগমন বার্তা। নেপালের আকাশে উড়তে শুরু করে মাঙ্গলিক ঘুড়ি। বৃষ্টি বন্ধ করার জন্য মেঘকে অনুরোধ জানায় ঘুড়িগুলি। কারণ নেপালের পবিত্র মাটিতে দুর্গা ভবানীর পা রাখার সময় আগত। শুরু হবে নেপালের সব থেকে বড় উৎসব 'বড়া দশেইন'। বাঁধনহীন আনন্দে মেতে উঠবে সমগ্র নেপাল। তার আগে নেপালের গ্রামগুলির গাছে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ঘাসের দড়ি দিয়ে বাঁধা বাঁশের দোলনা। দেবী দুর্গা ভবানীর আশীর্বাদ লাভ করার জন্য, অন্তত একবার সেই দোলনায় ওঠে।

'বড়া দশেইন' উৎসব চলে ১৫ দিন ধরে। আশ্বিনের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ থেকে কোজাগরী পূর্ণিমা অবধি। তবে প্রথম ন'দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই ন'দিন ধরে দেবী দুর্গা ভবানীর সাথে পূজিতা হন নবদুর্গা। দেবী দুর্গা ভবানী হলেন শুভ শক্তির বিজয় ও অশুভ শক্তির পরাজয়ের প্রতীক। তাই নেপালের হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা, এই ন'দিন তাঁদের প্রাণ-মন সঁপে দেন দেবীর পায়ে। তবে এই পনেরো দিনের মধ্যে, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলি হল প্রথম, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম ও পঞ্চদশ।

প্রথমা (ঘটস্থাপনা)

আশ্বিনের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথির শুভক্ষণে, মল্ল রাজাদের সুপ্রাচীন রাজপ্রাসাদ হনুমান-ধোকা থেকে

তাঁকে বাড়ির পুজোয় আমন্ত্রণ জানিয়ে আসেন সেই সদস্য।

মহা সপ্তমী (ফুলপাতি)

বড়া দশেইনের সপ্তম দিন অর্থাৎ মহা সপ্তমীতে অনুষ্ঠিত হয় 'ফুলপাতি'। এই পবিত্র দিনে, নেপালরাজের রাজকীয় জামারা ঘট, লাল কাপড়ে মুড়ে গোর্খা জেলা থেকে আনা হয় কাঠমণ্ডুর তুণ্ডিখেল ময়দানে। ঘটের সঙ্গেই লাল কাপড়ে মোড়া হয় কলাবউ, আখ গাছ সহ মোট ন'টি উপকরণ। যেগুলিকে একত্রে বলা হয় 'ফুলপাতি'।

মগর ব্রাহ্মণেরা খালি পায়ে হেঁটে গিয়ে গোর্খা দরবার থেকে এই পবিত্র ঘট ও 'ফুলপাতি' নিয়ে আসেন, তিন দিনে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে। মহা সপ্তমীর সকালে, কাঠমাণ্ডুর সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের, চিরাচরিত নেপালি পোশাক পরে, বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত থাকতে হয় তুণ্ডিখেল ময়দানে। সেখানে উপস্থিত থাকেন স্বয়ং নেপালরাজও। ঘটে বিরাজমান রাজভবানীর সামনে কুচকাওয়াজ করে নেপাল সেনা। দেবীকে দেওয়া হয় গান স্যালুট। এরপর নৃত্য, গীত ও শোভাযাত্রা সহকারে পবিত্র ঘট ও ফুলপাতিকে নিয়ে যাওয়া হয় হনুমান-ধোকা প্রাসাদে।

অন্যদিকে, এই দিন ভোরে বেলগাছকে পুজো করে, বেলপাতা নিয়ে আসা হয় প্রতিটি বাড়িতে। আরও আটটি উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয় ফুলপাতি। প্রথা অনুযায়ী বাড়ির দরজার সামনে প্রথমে রাখা হয় গৃহস্থের ফুলপাতিকে। এরপর ফুলপাতিকে পূজা করে নিয়ে যাওয়া হয় দশেইন ঘরে। নেপালের দুর্গাপূজার অন্যতম পবিত্র আচার হল এই 'ফুলপাতি'।

ভেসে আসে মালশ্রী ধুন। ছড়িয়ে পড়ে আকাশে বাতাসে। প্রাসাদ থেকে আকাশের দিকে দাগা হয় মাঙ্গলিক তোপ। শুরু হয়ে যায় নেপালের বহুকাঙ্ক্ষিত উৎসব 'বড়া দশেইন'। ঘরে ঘরে, মন্দিরে মন্দিরে শুরু হয় দুর্গা ভবানীর আবাহন।

এক সপ্তাহ আগে থেকেই দিনটির জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দেন নেপালের হিন্দুরা। পরিবারের সবাই মিলে বাড়ির একটি ঘরকে পরিষ্কার করেন। কারণ সেই ঘরে ন'রাত কাটাবেন ভগবতী জগদম্বা। ঘরের মেয়ে হয়ে। এই বিশেষ ঘরটিকে বলা হয় 'দশেইন ঘর'। একবার পরিষ্কার করা হয়ে গেলে, সেই ঘরে পরিবারের একজন সদস্য বা পুরোহিত ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবেন না। যিনি প্রবেশ করবেন, তিনিই সকাল সন্ধ্যায় করবেন দেবীর নিত্যপূজা।

এই দিন ঘরের নির্দিষ্ট কোণে মাটির সঙ্গে বালি ও গোবর মিশিয়ে তৈরি করা হয় আয়তাকার একটি বেদি। শুভ মুহূর্তে সেই বেদির ওপর স্থাপন করা হয় একটি ঘট অথবা মালসা। যেটির মধ্যে থাকে গোবর মেশানো মাটি। বেদিতে ঘট স্থাপন করার পরে, ঘটের মাটিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়ে বার্লির বীজ। ঢালা হয় পবিত্র নদীর জল। একইসঙ্গে বেদির ওপরেও ছড়িয়ে দেওয়া হয়, ভুট্টা, ধান ও অনান্য শস্যের বীজ। পবিত্র জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়ে বেদির ওপরেও। জল দেওয়া হয় ন'দিন ধরে। নেপালবাসীরা বিশ্বাস করেন, বেদিতে থাকা পবিত্র ঘটেই বিরাজ করেন দেবী দুর্গা ভবানী। কোথাও কোথাও ঘটের পিছনে রাখা হয় দুর্গা ভবানীর ছবিও।

ঘটের ভেতর রাখা, বার্লি বীজ অঙ্কুরিত হয়ে তৈরি হয় চারা। যাকে বলা হয় 'জামারা'। এই জামারা অত্যন্ত পবিত্র। কারণ এই বার্লি চারাগুলিই দেবী ভবানীর প্রতীক। ঘট স্থাপনের পর, ঘটের সামনে রাখা হয় পূজার অনান্য উপকরণ। দেবীর আবাহনী মন্ত্র পড়ে, দেবীকে ঘটে বিরাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান পূজক। দরজার বাইরে থেকে দেখেন পরিবারের অন্যান্য সদস্যেরা।

এই পদ্ধতিতে সকাল ও সন্ধ্যায় দেবীর পূজা চলে নবরাত্রির ষষ্ঠ দিন পর্যন্ত। ষষ্ঠ সন্ধ্যায় পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ কোনও সদস্য যান বেলগাছের কাছে। বেলগাছে বিরাজ করেন মহাদেব।

মহা অষ্টমী

বড়া দশেইনের উৎসবের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিনটি হল মহা অষ্টমী। মহা অষ্টমীতে ঘটের সামনে, দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে একে একে বসিয়ে দেওয়া হয় ধানের ন'টি স্তূপ। সর্বদক্ষিণে স্থাপন করা হয় ধানের প্রথম স্তূপটি। সেটি নিবেদন করা হয় দেবী শৈলপুত্রীকে। এরপর একে প্রথম স্তূপটির উত্তরে বসানো হয়, দেবী ব্রহ্মচারিণী, দেবী চন্দ্রঘণ্টা, দেবী কুষ্মাণ্ডা, দেবী স্কন্দমাতা, দেবী কাত্যায়নী, দেবী কালরাত্রি, দেবী মহাগৌরী ও দেবী সিদ্ধিদাত্রী ভগবতীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত স্তূপগুলি। প্রত্যেকটি স্তূপ রাখার সময় উদ্দিষ্ট দেবীর মন্ত্রচ্চারণ করা হয়। একই পদ্ধতিতে রাখা হয় বেলপাতা, নবপত্রিকা, সুপারি, মিষ্টান্ন, ফল ও দক্ষিণা।

মহা অষ্টমীতে দেবী দুর্গা ভবানী তাঁর দানবদলনী রূপ ধারণ ধরেন। তাই বাড়িতে বাড়িতে শুরু হয় অস্ত্রপূজা। ঘটের সামনে রাখা হয়, খুকরি, তরবারি, ছুরি, বর্শা। কোথাও কোথাও রাখা হয় কোদাল, শাবল, গাঁইতিও। পূজার পর বাড়ির সামনে বলি দেওয়া হয় কলা, শশা, কুমড়ো ও নারকেল। বলির সময় সবাই সমস্বরে চিৎকার করে ওঠেন 'জয় মা ভৈরবী' বলে।

অষ্টমীর রাত্রিকে বলা হয় 'কালরাত্রি'। এদিন রাতে শক্তিদেবীদের মন্দিরে মন্দিরে শুরু হয় পশুবলি। বলি দেওয়া হয় মহিষ, ছাগল, ভেড়া, শূকর, হাঁস, মুরগি ও পায়রা। নেপালবাসীরা মনে করেন রক্ত হল উর্বরতার প্রতীক। পশুর রক্ত জমিতে পড়লে জমি হবে উর্বর। নেপাল হবে শস্যশ্যামলা। বাড়বে রাজকোষে জমার পরিমাণ। তাই হয়তো বাধ্যতামূলকভাবে নেপালের প্রতিটি ভূমিরাজস্ব দফতরের সামনে পশুবলি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত। মহাষ্টমীর রাতেই পশুদের রক্তে লাল হয়ে ওঠে হনুমান-ধোকা প্রাসাদের প্রাঙ্গণ। একই সঙ্গে ৫৪টি মহিষ ও ৫৪টি ছাগল বলি দেওয়া হয় মধ্যরাতে। সেখানে পশুবলি চলে সারা রাত। উপস্থিত জনসাধারণের মধ্যে দেবীর প্রসাদ হিসেবে বিলি করা হয় পশু ও পাখির মাংস। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রান্না করা হয় প্রসাদি মাংস। তারপর কলাপাতায় সাজিয়ে, নিবেদন করা হয় দেবী দুর্গা ভবানীকে। পরে তা বিতরণ করা হয় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। এই প্রসাদি মাংস খাওয়াটাও অন্যতম পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করেন নেপালের হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা।

মহা নবমী

নেপালের মানুষের উৎসাহ তুঙ্গে ওঠে মহা নবমীতে। কারণ নবরাত্রির শেষ দিন মহা নবমী। এদিনও দুর্গা ভবানীর বিশেষ পূজার পর শুরু হয় পশুবলি। নেপালের লোকবিশ্বাস, মহা নবমীর দিন দেবীর ভয়ে ভীত অসুরেরা পশু ও মুরগির ছদ্মবেশ ধারণ করে দেবীর হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। ফলে অষ্টমীর থেকেও দ্বিগুণ উৎসাহে নেপাল জুড়ে শুরু হয় পশুবলি বা 'অসুর নিধন'। সরকারি ব্যবস্থাপনায় এদিনও অসংখ্য মহিষকে বলি দেওয়া হয় হনুমান-ধোকা প্রাসাদে। বছরের এই দিনটিতেই জনসাধারণের দর্শনের জন্য খুলে দেওয়া হয় হনুমান-ধোকায় থাকা তালেজু ভবানীর সুপ্রাচীন মন্দিরটির দরজা। মানুষের ঢল নামে মল্ল রাজাদের তৈরি মন্দিরটির প্রাঙ্গণে।

বিজয়া দশমী

বিজয়া দশমীর দিন গৃহস্থদের বাড়িতে দেবী দুর্গা ভবানীর সঙ্গে পূজিতা হন দেবী অপরাজিতা ভাগবতী, জয়া ও বিজয়া। পূজার পর দশেইন ঘর থেকে বাইরে নিয়ে আসা হয় দেবী দুর্গারূপী জামারা ঘটটিকে। প্রসাদ বিতরণের পর, গুরু, পুরোহিত ও বয়স্কদের কাছ থেকে একটি করে বার্লি চারা গ্রহণ করে পরিবারের নবীন প্রজন্ম। তাদের কপালে লাগিয়ে দেওয়া হয় চালের গুঁড়ো, দই ও সিঁদুর দিয়ে তৈরি গোলাপি রঙের জামারা টিকা। যাতে নবীন প্রজন্মের আগামী দিনগুলি সুখের হয়।

এরপর টিকা লাগানো শুরু হয় পরিবারের অন্যান্য সদস্য, আত্মীয় অনাত্মীয়ের কপালে। 'জামারা টিকা' হল বিজয়া দশমী ও বড়া দশাইন উৎসবের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আচার। বড়া দশেইনে জামারা টিকা অন্যকে দেন না বা অন্যের কাছ থেকে নেন না, এমন নেপালবাসী খুঁজে পাওয়া ভার। টিকা পরানোর পর্বটি চলতে থাকে নেপালের কোজাগ্রত (কোজাগরী) পূর্ণিমা পর্যন্ত। মহালক্ষ্মীর আরাধনার মাধ্যমে সেদিনই শেষ হয় 'বড়া দশেইন' উৎসব। আবার শুরু হয় দিন গোনা।

এভাবেই পনেরো দিন ধরে, দেবী দুর্গা ভবানীর আগমনের আনন্দে মেতে ওঠেন নেপালের হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা। বাড়ির পূজা সেরে, পরিবার নিয়ে তাঁরা ঘুরে বেড়ান নারাদেবী, বিজয়েশ্বরী, ইন্দ্রায়ণী, নক্সাল ভগবতী, শোভা ভগবতী, মাইতিদেবী, গুহ্যেশ্বরী, ভদ্রকালী, কালিকাস্থান, সঙ্কটা মহাকালস্থান, দক্ষিণা কালী, চামুণ্ডা দেবী ও দুর্গা ভবানীর মন্দিরে মন্দিরে। নব আনন্দে জেগে ওঠার জন্যেই, এই সময় বাড়ি ফিরে আসেন প্রবাসীরা। মানসিক দূরত্ব মুছিয়ে দিয়ে, এই উৎসবের মাধ্যমে শত্রুকেও বন্ধু করে তোলেন দেবী দুর্গা ভবানী। দৃঢ় করে তোলেন নেপালের সামাজিক বন্ধন।

তথ্য : ইন্টারনেট

কৃষির আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে
কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে
প্রয়োজনীয় তথ্যাদি কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়াই
আমাদের লক্ষ্য
কৃষি তথ্য সার্ভিস বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে
মাসিক কৃষিকথা পড়ুন। কৃষিকথা'র গ্রাহক হোন। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫.০০ টাকা বার্ষিক সডাক ৫০.০০ টাকা। কৃষিকথায় কৃষি বিষয়ক মানসম্মত লেখা দিন। লেখা পাঠাবার ই-মেইল ঠিকানা: editor@ais.gov.bd, dirais@ais.gov.bd
কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান নিয়মিত শুনুন - বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ বেতারের আঞ্চলিক অনুষ্ঠানসমূহ নিয়মিত শুনুন। বরগুনা জেলার আমতলিতে স্থাপিত কৃষি রেডিও এফএম ৯৮.৮ প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে ১১টা এবং বিকাল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সম্প্রচার উপভোগ করুন।
বাংলাদেশ টেলিভিশনের জনপ্রিয় কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান বাংলার কৃষি প্রতিদিন সকাল ৮ টার বাংলা সংবাদের পূর্বে ৭.৪০ মিনিটে ও মাটি ও মানুষ রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬.২০ মিনিটে সম্প্রচার করা হয়। নিয়মিত এ অনুষ্ঠান দেখুন।
কৃষি তথ্য সার্ভিস-এর ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র ইউনিটের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচারিত কৃষি বিষয়ক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নিজে দেখুন, অন্যকে দেখতে উৎসাহিত করুন।
সরাসরি কৃষি কল সেন্টার হতে কৃষি বিষয়ে সকাল ৯.০০টা হতে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত তথ্য সেবা ও পরামর্শ পেতে যে কোন মোবাইল হতে ১৬১২৩ নম্বরে কল করুন।
(শুক্রবার ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত)
16123
কৃষিবিষয়ক আধুনিক ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিতে ভিজিট করুন এআইএসটিউব (aistube.com)
কৃষি যোগাযোগ ও তথ্য সেবা কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন অফিস সময়ে সেবা চালু রয়েছে।
যোগাযোগের ঠিকানা : পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ০২-৫৫০২৮২৬০
ই-মেইল : dirais@ais.gov.bd, ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd
কৃষি তথ্য সার্ভিস
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
AIS

দুর্গাপূজার সম্প্রীতি ও বাংলাদেশ

হীরেন পণ্ডিত

সারা বিশ্বে সবার কাছে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরা সবাই মিলে পূজা উদ্‌যাপন করি। আমরা সব ধর্মের বন্ধুরা মিলে শৈশব থেকে একসাথে পূজা দেখে আসছি এবং উদ্‌যাপন করছি। তবে রাজশাহীর তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণের শাসনামল থেকে বাংলাদেশে এই দুর্গাপূজার প্রথম শুভ সূচনা হয় বলে জানা যায়। একসময় দ্বিতীয় কালাপাহাড়ের অভ্যুদয় ঘটে এবং বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় ধ্বংসের বিভীষিকার সূচনা করে। রাজা কংসনারায়ণ তখনকার দিনে অনেক টাকা ব্যয় করে বিশাল আয়োজনের মাঝে দুর্গোৎসবের উদ্‌যাপন করে তৎকালীন সারা ভারতবর্ষে ব্যাপক সাড়া জাগিয়ে তোলেন। রাজা কংসনারায়ণের অনুকরণে ভাদুড়িয়ার রাজা জগৎনারায়ণ মহাসমারোহে সুরথ রাজার বিধানে বাসন্তী পূজা করলেন। এভাবেই শুরু হল বাংলায় দুর্গাপূজার সমারোহ, শারদীয়া উৎসবের আমেজ। এ সকল আয়োজনের মাঝে বাংলার সামাজিক অঙ্গনে আসে এক নবজাগরণ। সংস্কৃতি অঙ্গনে সূচনা হয় এক বিপ্লব, যা শারদীয়া দুর্গোৎসবের মাঝে বিকশিত হয় বাংলার সকল মানুষের মাঝে এবং ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতাকে ছাড়িয়ে সকল ধর্মের লোকজনকে আকর্ষণ করে ব্যাপকভাবে বাঙালি সংস্কৃতির অঙ্গ এবং সম্প্রীতির বন্ধন হিসেবে।

বাংলাদেশে পঞ্চাশের দশকেও দুর্গাপূজা ছিল গ্রামকেন্দ্রিক এক আনন্দঘন আয়োজন। প্রায় প্রতিটি গ্রামে পূজা অনুষ্ঠিত হত এবং স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ ধর্মীয় ভাবনার উর্ধ্বে উঠে সার্বিক সহযোগিতা করতেন। দুর্গাপূজা মণ্ডপের আঙ্গিনায় রামায়ণ কীর্তন, পালাগান, কবির লড়াই অনুষ্ঠিত হওয়ার দৃশ্যই ছিল গ্রামের সকল মানুষের মাঝে আনন্দঘন এক মহামিলনের কেন্দ্রবিন্দু। দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে মেলাপ্রাঙ্গনে বসত আনন্দমেলা তাতে নাগরদোলা থেকে আরম্ভ করে মুরগির লড়াই সবই ছিল বিশাল আয়োজনের অংশ। বিভিন্ন রকমের নারিকেলের সন্দেশ, নাড়ু, নানা রকমের পিঠা-মিঠাই-মণ্ডা এসবই ছিল বাংলার শারদীয় উৎসবের প্রধান আকর্ষণ এবং মিলনমেলার অংশ।

বস্তুত বাঙালি জীবনে এক উদার, সহনশীল, সমন্বয়ধর্মী, মানবতাবাদী ধারা দৃশ্যমানভাবে প্রবাহিত ছিল বংশানুক্রমে। বাংলার লালিত আদর্শ ও সংস্কৃতির পদমূলে আঘাত করেছে এক 'নীরব চক্রান্ত' যা সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় মৌলবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং উগ্রপন্থী অপশক্তিকে আমন্ত্রণ করে বাঙালির জীবনধারা ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। এ চক্রান্তকে তীব্র ও ভয়াবহ করেন পূর্ব পাকিস্তানের শাসকরা। ১৯৬৪ সালের ভয়াবহ দাঙ্গা আঘাত হানে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে, গোটা বাঙালির জীবনধারায়।

তবে দুর্গাপূজা এখন হয়েছে শহরকেন্দ্রিক। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, ময়মনসিংহ খুলনাসহ বড় বড় মহানগরে দুর্গাপূজার মহাধুমধাম। অনেক পূজা অঙ্গনে চলে মন্ত্রী, দলীয় নেতাদের প্রশংসা এবং তাদের আগমন ঘিরে বিশাল আয়োজন। চারদিকে ফুলের সমারোহ এসবের মাঝে দুর্গাপূজা যেভাবে দেশের জনগণের মাঝে উৎসবের আমেজ ও সম্প্রীতির বন্ধনে বাংলার মানুষকে বিমোহিত করে, এমনটি অন্য কোনো দেশে দৃশ্যমান হয় না।

সমাজ ও জীবন দর্শন নিরন্তর পরিবর্তনশীল। সমাজের অভ্যন্তরে অবিরত ঘটে চলা দ্বন্দ্ব-সংঘাত বা পার্থিব বিষয় ভাবনা কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে সমাজ বুননে চিরকালীন সহিষ্ণু কাঠামোকে দুর্বল করে ফেলে। শতাব্দী লালিত সম্প্রীতির বন্ধনও কখনও বা ক্লেদক্লিষ্ট হয়ে যায়। সামাজিক পরিসরে ক্ষয়, অসুস্থতা বাড়িয়ে তোলে। আমাদের ভীষণ চেনা পরিসরও মাঝে মাঝে অচেনা হয়ে দেখা দেয়।

যে কোনো উপলক্ষই হয়তো প্রাচীন এ জনপদে উৎসবের আকার ধারণ করে। উৎসব যখন মহামিলনের কেন্দ্র হয়ে যায়, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিস্ফোরিত জনস্রোতে বাঙালি তার আত্মপরিচয়ের ঠিকানা খুঁজে পায়। বাঙালির জাতিসত্তা হয়ে ওঠে অনন্য। হাজার বছরের জীবনচর্যা, পরম্পরা, সমাজ বিকাশের ধারা- সবকিছুই এ নৃ-গোষ্ঠীর মানসিক গড়নকে হয়তো এভাবেই প্রস্তুত করেছে। আর বাঙালি জাতি যেসব অনন্য বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশ্ব সভায় খ্যাত; চিন্তায়, চেতনায়, জীবনশৈলীতে কৌলীন্যের দাবিদার, নিঃসন্দেহে তার পরিমাপক এ জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রগতিবাদী, সহনশীল ও উদার মানবিক ঐতিহ্য- যার অনুপস্থিতি আমাদের জাতিগত সত্তাসংকটকে প্রকট করে তুলতে পারে। সনাতন ধর্মে দেবী দুর্গা পরমা প্রকৃতি ও সৃষ্টির আদি কারণ। বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে নিয়ত যে শক্তি বা তেজ

বিচ্ছুরিত হয়; যা সৃষ্টি, পালন কিংবা প্রলয় সাধনে সক্ষম- তাই প্রাচীন শাস্ত্রে প্রকৃতি হিসেবে পরিচিত। এই শক্তি মূলত রূপহীন, নিরাকার। কর্মের মধ্যেই তার সত্তা। কর্মই তার পরিচয়ের দ্যোতক। সনাতন ধর্মে যে দেবী দুর্গার পূজা করে তিনি দেব-দেবীর সম্মিলিত রূপ, তিনিই দশভূজা, বিশ্বশক্তি, মহামায়া। দেবী প্রসন্ন হলেই ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ হয়- এটিই দেবীভক্তের চিরায়ত বাসনা।

এ কথা সত্য যে, বাংলাদেশে পূজার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, জাঁকজমকের কমতি নেই, পূজার আয়োজনে রাষ্ট্রের শুধু আইনি সুরক্ষা নয়- রয়েছে বৈষয়িক পৃষ্ঠপোষকতা। বহুস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা। তবু কি আমরা নিঃশঙ্ক, নির্ভয়, নির্ভাবনায় উৎসবে মেতে উঠতে পারি। সংখ্যাবৃদ্ধি বা উজ্জ্বলতাই সব নয়, আসল হল অন্তরের সত্তা। নিরাপত্তাবোধের ঘাটতি উৎসবকে সম্পন্ন করে না।

এটা ঠিক যে, বিশ্বব্যাপী এখন একটা অস্থিরতা, ধর্ম-জাতি তথা বিভাজন-বিদ্বেষের লেলিহান শিখা সমাজকে বিপন্ন করছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এ অসহিষ্ণুতার বিষাক্ত বাতাস ছড়িয়ে পড়ছে। দশকের ব্যবধানে আমাদের সমাজের চেহারায় কি একটু বদল আসছে, আমাদের আচারে, বিচারে, পোশাকে, কল্পনায়, ভাবনায় আমরা কি অনৈক্যের প্রাচীর তুলতে চাইছি, পরস্পর থেকে পরস্পর কি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি, আমাদের চেতনায় কি বিভেদের সুর ক্রমশই প্রবল হচ্ছে, আমরা কি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ হারাচ্ছি, অবিশ্বাস ও বিভাজনের জমাট মেঘ আমাদের আচ্ছন্ন করছে কি না- ভেবে দেখতে হবে। জীবনকে নতুন করে শুরু করার শপথ। সেখানে দ্বেষ নেই, বিভেদ নেই, কলহ নেই; আছে মাধুর্য, সৌন্দর্য, সৌহার্দ্য, সৌভ্রাতৃত্ব। এই বার্তাটি আজ ভীষণ জরুরি। শুধু কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য নয়, কোনো বিশেষ সমাজ বা গোষ্ঠীর জন্য নয়, গোটা মানবজাতির অস্তিত্বের জন্যই তা ভীষণ প্রয়োজন। অসুর সর্বতো বিরাজমান। তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অঙ্গীকার আছে এই শপথে। অনাগত ভবিষ্যতের কাছে আমাদের দায় কতটা, তা প্রমাণের জন্য আমাদের হাতে হয়তো আর বেশি সময় নেই। তবে ভরসা রাখতেই হবে কালোত্তীর্ণ এ বিশ্বাসে- অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের, অশুভের বিরুদ্ধে শুভর বিজয় অনিবার্য। আরো উজ্জ্বল হোক বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।

বড় হয়েছি নেত্রকোণা জেলার ছোট একটি গ্রামে। তবে নেত্রকোণা জেলা শহর থেকে খুব বেশি দূরে নয়। বাস বা ট্রেন দু'ভাবেই নেত্রকোণা যাওয়া যায়। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের গ্রামে দুর্গাপূজার আয়োজন শুরু হয়নি। এখন অবশ্য সময় বদলেছে, এখন গ্রামেই ঘটা করে ব্যাপক আলোকসজ্জার মাঝে দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়। শরৎকাল আসার অপেক্ষা করতাম আমরা সবাই। পূজা দেখার জন্য টাকা পয়সা জমানো, যাতে করে অনেক আনন্দ নিয়ে পূজা দেখা যায়।

বন্ধু-বান্ধব মিলে সবাইকে নিয়ে আমরা পূজা দেখতে যেতাম। নতুন জামা কাপড় কেনা ছিলো একটি অবধারিত বিষয়। আমরা পায়ে হেটে সব বন্ধু-বান্ধব মিলে পূজা দেখতাম। তখন নেত্রকোণা শহরে দশ-বারোটি পূজা হতো। আমরা পায়ে হেটে সবগুলো পূজা দেখে ফেলতাম। অষ্টমি পূজার দিন অনেক আনন্দ করে পূজা দেখে সিনেমা দেখাটা একটি নির্ধারিত বিষয় ছিলো। বন্ধুদের নিয়ে হৈ চৈ করে পূজা দেখা আর সিনেমা দেখা মনের মাঝে অন্য এক অনুভূতি কাজ করতো। এভাবে শিশু থেকে কৈশোর ও যুবক বয়সে পূজা দেখেছি নেত্রকোণায়। ১৯৮৫ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর ১৯৮৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর আমার নেত্রকোণার পূজা দেখার পালা শেষ হয়ে যায়। নানা ব্যস্ততার কারণে কখনো আর পূজার সময় নেত্রকোণা যাওয়া হয়না। মাঝে মাঝে গ্রামে এবং নেত্রকোণায় যাওয়া হয় কিন্তু পূজার সময় তা একেবারেই হয়ে উঠেনা। এখন ঢাকা শহরের বিভিন্ন পূজা মন্ডপেই পূজা দেখা হয়। কালের বিবর্তনে আজ নিজেই স্বামী ও বাবা রূপ ধারণ করে স্ত্রী-সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে পূজা দেখা হয়।

বাঙালির দুর্গাপূজা কবে শুরু হয়েছিলো তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় তবে রাজশাহীর কংশনারায়ণ শুরু করেন বলে কথিত আছে। তবে একথা সত্যি যে দুর্গাপূজার ইতিহাস একেবারেই অর্বাচীন নয়। দুর্গাপূজা বৈদিক যজ্ঞের রূপান্তর, যুগে যুগে লৌকিক ও পৌরাণিক হিন্দুধর্মের একটি মিলনক্ষেত্র ছিলো দুর্গাপূজার প্রাঙ্গণ। অর্থাৎ, দুর্গাপূজা বিভিন্ন শতাব্দী থেকেই ছিল উৎসব। কারো কারো ধারণা, জমিদার বাড়ির প্রাঙ্গণ থেকেই দুর্গাপূজা হয়েছে বাঙালির জাতীয় উৎসব। বৈদিক শারদ যজ্ঞ ছিল সর্বজনীন এক ধর্মানুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানই যুগে যুগে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজা পারিবারিক, বারোয়ারি, তারপর সর্বজনীন রূপ নিয়েছে। আজ আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও উদ্‌যাপিত হচ্ছে দুর্গাপূজা। আমাদের বাংলাদেশে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এবং পৃথিবীর অনেক দেশের সেই শহরগুলোতে, যেখানে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে। সবাই বছরের এই সময়টা নানাভাবে, নানা ভঙ্গিতে উদ্‌যাপন করে উৎসবের দিনগুলো। বর্ণিল মাত্রায় আনন্দ উৎসবের আন্তরিক ও বর্ণাঢ্য আনন্দে মেতে উঠি আমরা।

বর্তমান সময়ে পূজা উদ্‌যাপন, মণ্ডপ তৈরিতে শৈল্পিক নানা প্রচেষ্টা দেখা যায় আগে এতাটা ছিলোনা যা দেখেছি আমাদের ছোটবেলায়। আলোকসজ্জায় প্রযুক্তি উন্নয়নের ধারা যোগ করেছে আশ্চর্য রকম বৈচিত্র্য। উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত, নাটক, ঢাকের বাজনার প্রতিযোগিতা, ছবি আঁকা, নৃত্যকলা, তারকাদের উপস্থাপনা ও কথন আরও কত কী যুক্ত হয়েছে! বর্তমান সময়ে। প্রসাদ বিতরণের বিষযটি আগের মতো আপ্যায়নের ধারায় চর্চিত হচ্ছে পূজা কমিটিগুলোর সাধ ও সাধ্য অনুযায়ী। সবাইকে নিয়ে ধর্মীয় আঙ্গিকে সামাজিক উৎসব উদ্‌যাপন, নতুন পোশাক, উপাদেয় খাবার-দাবার, আপ্যায়নের আগ্রহ ও উপহার বিতরণ সবই প্রতিবছর নতুন মাত্রা তৈরি করে চলেছে। সময়ের গতিময়তা যা আজ সর্বজন আদৃত। পূজার আয়োজনে, সাজে ঐতিহ্যবাহী রূপটাও দেখা যায়, পূজা উদ্‌যাপনের সঙ্গে আগের দিনে হয়তো এতটা ছিলো না, আমাদের ফেলে আসা ছোট বেলার দিনগুলোতে।

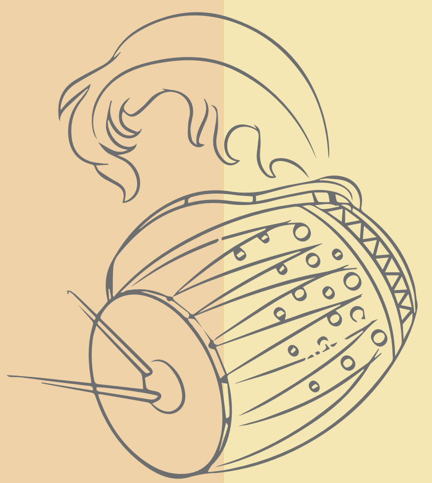

বাঙালির দুর্গাপূজা

চিররঞ্জন সরকার

বাঙালি হিন্দুর সবচেয়ে বর্ণাঢ্য ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। বাঙালির আটপৌরে সংসারে হাজারো না পাওয়ার হতাশা, ব্যর্থতা এবং বিপর্যয়ের মধ্যেও অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে দেবী দুর্গার উপাসনা করে। বিশ্বাস করে দেবী তার সব দুর্গতি মোচন করবেন। এই বিশ্বাস নতুন করে চলার শক্তি ও অনুপ্রেরণা দুই-ই জোগায়। নানা আচারের মাধ্যমে দেবী দুর্গার স্তব করে আলোকিত জীবনের আকাঙ্ক্ষায়।

শারদীয় দুর্গাপূজাকে অকাল বোধন বলা হয়। অর্থাৎ অকালে দেবী দুর্গাকে জাগানো হয়। হিন্দু শাস্ত্রমতে পুরো বছরকে উত্তরায়ন এবং দক্ষিণায়ন এই দুটি কালে ভাগ করা হয়। মাঘ থেকে আষাঢ় পর্যন্ত উত্তরায়ন এবং শ্রাবণ থেকে পৌষ মাস পর্যন্ত সময়কে দক্ষিণায়ন কাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উত্তরায়ন কালে দেব-দেবীদের জাগ্রত কাল এবং দক্ষিণায়ন দেব-দেবীর নিদ্রাকাল। রামচন্দ্র যুদ্ধের প্রয়োজনে অকালে দেবীকে বোধন অর্থাৎ স্তব-স্তুতির মাধ্যমে জাগরণ ঘটিয়ে দুর্গাপুজো করেছিলেন। এ কারণে শারদীয় দুর্গাপূজাকে অকাল বোধন বলা হয়। দেখা যায় দেবীকে নিদ্রা থেকে জাগানোর জন্য বেলতলায় মহাদেবের স্তব করে অনুমতি নিয়ে বোধন ঘটাতে হয়।

আমরা দুর্গাপূজা বললেও আসলে এই পূজা দুর্গার একার নয়। সঙ্গে আরও অনেকেই আছেন। দুর্গা আসেন সবাইকে নিয়েই? ভালো-মন্দ, শত্রু-মিত্র, গাছ-প্রাণী সঙ্গে নিয়েই। চালচিত্রে শিব আছেন, তো পায়ের নিচে অসুর। কলাগাছ বউ, পেঁচা, হাঁস, ইঁদুর, ময়ূর বাহন। হাসিকান্না, সুজন-দুর্জন, পশুপক্ষী-উদ্ভিদ সমাহারে আমাদের জীবন-পথ চলাটাকেই সহজ করে চিনিয়ে দিতে চান?

দেব-দেবী মানুষের কল্পনামাত্র। নিজের কল্যাণকামনায় এবং অপশক্তি বধে মানুষ যুগে যুগে নানা দেব-দেবীর কল্পনা করেছে। এই কল্পনার রূপটিই ধরা পড়ে দুর্গাপরিবারের চিত্রে। দুর্গাপরিবারের চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায়, মা দুর্গা মহিষাসুরের সঙ্গে ধুন্ধুমার লড়াই করছেন, অথচ তার ছেলেমেয়েরা নিতান্ত উদাসীনভাবে পাশে দাঁড়িয়ে। সুদর্শন কার্তিক তার অস্ত্র তোলেন না, গণেশের মুখে তো একটা হাসির আভাস, লক্ষ্মী নিজের ঝাঁপিটা আরও শক্ত করে চেপে ধরেন, সরস্বতীও বীণা হাতে দিব্যি দাঁড়িয়ে থাকেন! দুর্গাপরিবারের এই চিত্র অবশ্য নিতান্তই বাঙালির সৃষ্ট।

দুর্গার নাম প্রথম পাওয়া যায় বৌধায়ন এবং সাংখ্যায়নের সূত্রে। ভারতবর্ষের পৌরাণিক মহাকাব্যগুলোতে ইতস্তত দেবী, শক্তি ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু দশভুজা যুদ্ধরতা দেবীর বিশেষ কোনো খবর সেখানে নেই। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে আছে, অর্জুন দুর্গার পূজা করছেন। স্কন্দ-কার্তিকের মহিষাসুর নিধনের কথাও আছে। কয়েকটি পুরাণে দুর্গার উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু হিন্দু দেব-দেবীদের মধ্যে তিনি যথার্থ গুরুত্বের আসনে নেই।

দুর্গা সম্পর্কে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় গুপ্তযুগের পরে। বাংলায় আর একটু পর থেকেই দেবীর নানান রূপ সম্পর্কে লেখা ও ভাস্কর্য আসতে শুরু করে, কিন্তু আজকের এই প্রতিমার রূপটিতে পৌঁছতে আরও কয়েক শতাব্দী লেগে গিয়েছিল। পঞ্চদশ শতকে কৃত্তিবাসী রামায়ণে যুদ্ধরতা দেবী এবং রামচন্দ্রের অকালবোধন সম্পর্কে প্রচলিত নানান লোককাহিনিকে প্রথম একসূত্রে গাঁথা হয়, তৈরি হয় তার প্রথম নির্দিষ্ট বিবরণ।

আশ্বিন-কার্তিকে দুর্গাপূজার ব্যাপারটা একেবারেই এই অঞ্চলের কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত। এখানে আমন ধান আসার অনেক আগে থেকে আউশ ধানের প্রচলন ছিল, সেই ধান পাকার সময়েই এই পূজা। মহিষের ব্যাপারটা সম্পর্কে প্রচলিত মত হলো, এই প্রাণীটি নিচু জমিতে বাস করত, এই অঞ্চলে চাষের প্রসারের জন্য কৃষিজীবী মানুষ ক্রমেই মোষ তাড়িয়ে মেরে জমি দখল করে। মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার আরাধনা হয়তো এই মহিষ নির্মূল অভিযানকে একটা ধর্মীয় বৈধতা দেওয়ার কৌশল ছিল, বিশেষ করে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বা কংসনারায়ণের মতো জমিদারদের পক্ষে, যাদের সমৃদ্ধির মূলে ছিল কৃষির প্রসার।

গবেষকদের কেউ কেউ বলছেন, সিংহবাহিনী দুর্গাকে গুপ্তযুগের পরে বাংলায় বাইরে থেকে আমদানি করা হয়, কিন্তু অন্যদের মতে, এই অঞ্চলেই তার উৎপত্তি। এক অর্থে দুটো মতই ঠিক, কারণ এই দুর্গার স্থানীয় বৈশিষ্ট্য আছে, আবার বহিরাগত উপকরণও আছে। কিছু কিছু দুর্গামূর্তিতে দেখা যায়, সিংহের বদলে দুর্গার বাহন হলো গোধিকা বা গোসাপের মতো একটি প্রাণী, কালকেতুর কাহিনিতে যার কথা আছে। লক্ষণীয়, গোসাপ অনেক বেশি প্রাকৃত, সিংহ সে তুলনায় সংস্কৃত

প্রাণী। উনিশ শতক পর্যন্ত বাংলার পটুয়া ও চিত্রকররা সিংহটাকে ঠিক বাগে আনতে পারতেন না, কারণ তারা তো জীবনে এই প্রাণীটিকে দেখেননি। উত্তর ভারতে আবার দেবী এখনো রয়েল বেঙ্গল টাইগারের পিঠে, 'শেরাবালি'। মজার ব্যাপার বটে।

ইন্দোনেশিয়ায় বোরোবুদুর, সুরাবায়া, বান্দুং-এর মতো কিছু জায়গায় ছয় বা আট হাতবিশিষ্ট দুর্গার দেখা মেলে। জাভার একটি লিপিতে দেখা যায় এক রাজা যুদ্ধের আগে এই দেবীর পূজা করেছিলেন। জাভায় পনেরো ও ষোলো শতকে দুর্গাকে রক্ষয়িত্রী হিসেবে আরাধনার প্রবল প্রচলন হয়।

আসলে পৌরাণিক কাহিনি থেকে দুর্গাপূজার শুরু। কিন্তু বাঙালি তার সৃজনশীল ভাবনা দিয়ে দুর্গাকে ঠিক ঘরের মেয়ে বানিয়ে ফেলেছে। সাধারণ মেয়ে, তবে দাপুটে। এই দাপুটে মেয়ের কত নাম! এক অঙ্গে বহুরূপ। শরৎ ঋতুতে আবাহন হয় বলে দেবীর আরেক নাম শারদীয়া। এ ছাড়া মহিষাসুরমর্দিণী, কাত্যায়নী, শিবানী, ভবানী, আদ্যাশক্তি, চণ্ডী, শতাক্ষী, দুর্গা, উমা, গৌরী, সতী, রুদ্রাণী, কল্যাণী, অম্বিকা, অদ্রিজা এমন কত নাম আছে তার। ঠিক দাদিরা যেমন আমাদের আদর করে একটা নামে ডাকে, মামার বাড়িতে আদিখ্যেতা করে অন্য নামে ডাকা হয়। আবার বাবার দেওয়া একটা নাম, মায়ের দেওয়া একটা নাম, স্কুলের জন্য একটা ভালো নাম। মা দুর্গারও তেমনি অনেক নাম। কারণ সে তো আমাদেরই ঘরের মেয়ে।

বাঙালির আপন মনের মাধুরী মেশানো দুর্গা তার সন্তান কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতীকে নিয়ে কৈলাস থেকে হিমালয়ের ঘরে বাপের বাড়ি আসেন। বাঙালির ঘরে মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি আসার মতো আনন্দ। বিশ্বসংসারে আমরা শিক্ষিত, অশিক্ষিত, খেটে খাওয়া মানুষ, ব্যবসায়ী বৈশ্য, শাসনকর্তা- সবাই বিশ্বজননীর সন্তান- সরস্বতী, কার্তিক, লক্ষ্মী ও গণেশের মতো সবাই আপন। সন্তানদের কল্যাণের জন্য মা দুর্গা সর্বদাই উদগ্রীব। তাই ১০ দিক থেকে সন্তানদের রক্ষা করার জন্য তিনি ১০ হাতে ১০ অস্ত্র ধরেছেন।

তবে বাঙালি যেভাবে দুর্গাপূজাকে আত্মস্থ তথা জীবনের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছে, তেমনভাবে আর কেউ করতে পারেনি। মাতৃরূপে বা শক্তিরূপে দুর্গা যেমন বাঙালির অন্তরজুড়ে বিরাজ করছেন, তেমনি কন্যারূপে উমা বাঙালির সংসারে এক অভুতপূর্ব আবেগের সঞ্চার করেছে। কথিত আছে, গিরিরাজ হিমালয় ও তার স্ত্রী মেনকা কন্যা উমা বা পার্বতীকে বিয়ের পর কৈলাসে শিবের ঘরে পাঠিয়েছিলেন। বৎসারান্তরে সেই কন্যাকে দেখার জন্য মা মেনকার ব্যাকুল প্রার্থনা যেন প্রতিটি বাঙালি পরিবারের সর্বজনীন প্রার্থনায় পরিণত। ঘরের মেয়ে ঘরে আসবে- তাই বাঙালি হিন্দুর ঘরে ঘরে দেখা দেয় আনন্দের শিহরণ। নতুন জামাকাপড় পরে দুঃখকে বিদায় দিয়ে আনন্দময় হয়ে ওঠে বাংলার আকাশ-বাতাস। এভাবে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে সামাজিক উৎসবে পরিণত করার ঘটনা পৃথিবীতে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। দেবী দুর্গাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য বাঙালির আগমনী সংগীত আমাদের জীবনপ্রবাহে মিশে যাওয়া এক অবিচ্ছেদ্য ধারা। এর তাৎপর্য হৃদয় দিয়ে, গভীর বোধ দিয়ে অনুভব করতে হয়। ধর্মীয় অনুশাসন ও বিশ্বাসের বাইরের এ বোধ। এটাই চিরন্তন মানবিক মূল্যবোধ।

সবাই মিলে নিরুপদ্রবে ইচ্ছেমতো পূজার আনন্দে শামিল হতে পারলে উৎসব তার প্রকৃত তাৎপর্য ফিরে পাবে। আর এখান থেকেই নতুন করে আগামী এক বছর চলার শক্তি ও পাথেয় সংগ্রহ করে মানুষ আবার নতুন করে জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে। সংসারের সব অসুরকে হারিয়ে নতুন এক উজ্জ্বল, উচ্ছল জীবনবোধে উদ্বেল হয়ে শুরু হবে নতুন করে পথচলা। দুর্গাপূজার মূল তাৎপর্য এটাই!

লেখক : কলাম লেখক

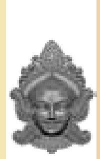

চন্ডীতত্ত্ব ও দুর্গাপূজা

রণজিৎ মোদক

স্মরণাতীত কাল হতে সনাতন আর্যধর্মের সাধনা ও আচারানুষ্ঠান বিভিন্ন ধারায় প্রভাহিত। তন্মধ্যে শাক্ত আর বৈষ্ণব ধারা দুটি পৃথক হলেও উদ্দেশ্য মূলত এক। বেদের যেমন দুটি ধারা একটি কর্মকান্ড অপরটি জ্ঞান কান্ড। কর্ম ও জ্ঞানের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। জ্ঞানেই ঈশ্বর। বেদের একটি ধারা বিবিধ উপনিষদ, যজ্ঞকান্ডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। মানব দেহকে অবলম্বন করে যোগশাস্ত্র উদ্ভূত তা সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করছে। বেদের ব্রহ্মকেই তন্ত্রশাস্ত্রে ব্রহ্মময়ী মহাশক্তি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যিনি সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়ের কর্তা তিনিই শক্তিরূপা চন্ডী।

যে শক্তি জীবের অন্তরের শক্তিকে জাগ্রত করেন তিনিই চন্ডী। আর সেই শক্তিই যখন জীবের দুর্গতি নাশ করেন তিনিই দুর্গা। চন্ডী মার্কন্ডে ও পুরানের অন্তর্গত। এতে সাতশ' শ্লোক রয়েছে তাই একে সপ্তসতী নামে অভিহিত করা হয়েছে। শ্রী শ্রী চন্ডীতে আত্মার শক্তিকে জাগ্রত করার দিক নির্ণয় করা হয়েছে। যথ না হাঁটলে পথ ফুরায় না। সেই রূপ সাধনা না করলে সিদ্ধি লাভ সম্ভব নয়। দুঃখ, দারিদ্র, শোক বেদনাময় পৃথিবীতে মুলতঃ কেউ সুখী নয়।

সুখ নামের কল্পিত পাখির পিছে আমরা সবাই দৌড়ে বেড়াচ্ছি। কিন্তু সুখ কোথায়? মেধামুনি রাজ্যভ্রষ্ট বিষাদগ্রস্ত মহারাজ সুরথ ও স্বজন কর্তৃক বিতাড়িত সমাধি নামক বৈশ্যকে মহাশক্তি সাধনা পথের মাধ্যমে যথাক্রমে স্বাধিকার ও মুক্তিলাভের উপায় নির্দেশ দেন। স্মরণাগত শিষ্য তত্ত্ব জিজ্ঞাসু ভক্ত মহারাজ সুরথ ও বিশ্য সমাধিকার নিকট মেধামুনি দেবাসুর সংগ্রামে বার বার পরাজিত দেবগণ কিরূপে আত্মশক্তির সমন্বয়ে মহাশক্তির উদ্বোধন ও বিকাশ সাধন করে পরিণামে নিজেদের স্বাধিকার পুনরুদ্ধার করেছিলেন তা বর্ণনা করেছেন।

সুরথ রাজা লক্ষ বলী দিয়ে সিদ্ধিলাভ করেন। মানব হৃদয়ে লাখ লাখ আশা লাখ ফনার চারিদিক বিস্তারিত হচ্ছে। কিন্তু লক্ষস্থির না হওয়ায় সিদ্ধিলাভ হচ্ছে না। কোনো কর্মে সিদ্ধিলাভ করতে হলে, প্রথমে লক্ষ্যকে স্থির করতে হবে। লক্ষ্যস্থির করে সিদ্ধি লাভের প্রত্যাশায় সাধনা করা চাই।

সমস্ত তন্ত্রের সার চন্ডীর মূল বেদে প্রতিষ্ঠিত। প্রথম চরিত্রে ঋগ্বেদ স্বরূপা, মধ্যম চরিত্র যজুবেদ স্বরূপা এবং উত্তম চরিত্র সামবেদ স্বরূপা। চন্ডী গ্রন্থ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে দেবী মহাত্ম্যের সূচনা, দ্বিতীয় ভাগে মূল গ্রন্থ, তৃতীয় ভাগে রহস্যক্ষয়। এখানে পরমাত্মাকে নানান রূপে, নানাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সাধনার পথে বিঘ্ন বিপদ দূরীভূত করার জন্য মনঅন্তঃ অন্তঃ মূখী মাতৃমুখী করে অভীষ্ট পথে অগ্রসর হতে হয়। নচেৎ মনের মাঝে মায়া প্রভাবে জ্ঞান শক্তিকে আবৃত করে রাখে। মেঘের আড়ালে সূর্য আবৃত হলে পৃথিবী অন্ধকারময় হয়। অজ্ঞানতার অন্ধকারে মানুষ যখন আবৃত, তখন সে সমস্ত কিছুই অন্ধকার অনুভব কমে। চন্ডী হচ্ছে শক্তিরূপা। জ্ঞান রূপে হৃদয়ে অবস্থান করেন। চন্ডীর উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত। কোন কোন পন্ডিতগণের মতে নর্মদা অঞ্চলে বা উজ্জীয়নীতে "শ্রী শ্রী চন্ডী" রচিত। কিন্তু পন্ডিত দক্ষিণারঞ্জণ শাস্ত্রী ঐতিহাসিক যুক্তি সহকারে উক্ত মত খন্ডণ করেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, সম্ভবত বাংলাদেশেই চন্ডীর জন্মস্থান। স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমে নর্মদা তীরে মহামায়া চন্ডীর সাধনা করতেন। তিনি চন্ডীর উৎপত্তি স্থান সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে তন্ময় হয়ে মহামায়া মায়ের প্রতি অভিমান বশত নর্দমার জলে প্রাণ ত্যাগের উদ্দেশ্যে ঝাঁপ দিতে গেলে দেবী দৈববাণী করলেন, "তুমি বাংলার পূর্ব প্রান্তে চন্দ্রনাথ তীর্থে গিয়ে তার দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত নাভিগংগা আবিষ্কার কর। ঐ স্থানেই আমার আবির্ভাব হয়েছিলো। এদিক দিয়ে ইতিহাসের পাতা ও ভৌগলিক স্থান লক্ষ্য করলে দেখা যায়, চট্টগ্রাম শহর হতে এগার বার মাইল দুরে করলাডাঙ্গর পাহাড়ে অবস্থিত মেধাআশ্রম। এখানে বর্তমানেও একটি ক্ষণিকায়া পার্বত্য জলধারা প্রবাহিত। এর পাশেই মেধামুনির পদচিহ্ন নামে একটি পায়ের দাগ রয়েছে।

জগত সৃষ্টি লগ্নে ব্রহ্মা মধু-কৈটব দুই দৈত্যের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে স্বয়ং বিষ্ণুর যোগ নিদ্রা ভঙ্গ করেন। তখন ব্রহ্মা যোগমায়ার স্তব করেন। কৃত্তিবাস কৃতবাংলা রামায়নে রামচন্দ্র ত্রেতা যুগের রাবন বধের অকাল বোধন করেন। শরৎকালে এ পূজা করা হয়। বসন্তকালে বাসন্তি পূজা করার নিয়ম রয়েছে। শ্রী চন্ডীর দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবতী বাক্যে উভয় পূজার নিয়ম রয়েছে। মহাভারতেও দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দুর্গার (চন্ডীর) প্রার্থনা করার উপদেশ দিয়েছিলেন। পদ্ম পুরানে শ্রী চন্ডীর কাহিনী রয়েছে। কখনো উমা কখনো পার্বতী নামে চন্ডীকে সাজানো হয়েছে। সতীরূপে চন্ডীর দেহত্যাগ সে এক অপূর্ব কাহিনী। সতীর দেহ বায়ান্ন খন্ডে খন্ডিত করার পর তা বায়ান্ন তীর্থ ক্ষেত্রে রূপ নিয়েছে।

আদিকাল থেকেই ভারতবর্ষে শক্তি সাধনার ধারা চলে আসছে। ভারত বর্ষের বাইরেও তিব্বত, কাতার চীন, জাভা, ব্রহ্মদেশ, জাপান এমনকি বৌদ্ধ ধর্মেও শক্তি পূজা অনুপ্রবেশ করেছিলো। মাতৃভাবের সাধক রাম প্রসাদ, রাজা রাম কৃষ্ণ, বামাক্ষেপা, শর্বানন্দ ঠাকুর, সাধু তারা চরন, শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রক্ষচারী ও ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, "যিনি উপনিষদের পরব্রক্ষ তিনিই তন্ত্রের মহামায়া।" রাম প্রসাদ গেয়ে উঠলেন, কালীব্রক্ষ জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি। গীতায় শ্রী কৃষ্ণ বলেছেন, পিতাহমস্য জগতোধাতা মাতা পিতামহঃ কলিযুগে বৈষ্ণব অবতার শ্রীচৈতন্য ভগবতে ভগবতীর কথা উল্লেখ করেছেন।

শ্রী শ্রী চন্ডীতত্ত্বে প্রবেশ করতে হলে, বর্তমান যুগের বহু মনীষী ও সাধকদের বিভিন্ন গ্রন্থ প্রনিধানযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলা কান্তের দুর্গোৎসব, নবীণ চন্দ্রেম 'চন্ডীর ব্যাখ্যা' সত্য দেবের সাধন সমর, বিজয় কৃষ্ণের 'মা আমার কাল কেন? নজরুলের শ্যামা সংগীত, স্বামী বিবেকানন্দের কালী, দি মাদার অদ্বৈতনন্দের 'দশমহাবিদ্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাতীয় কবি নজরুল তার আমি সৈনিক প্রবন্ধে মানুষের মাঝে অন্তরগত দু'টি রূপের কথা উল্লেখ করেছেন। পুরুষের মাঝে স্নেহ-মায়া-মমতা মাতৃ হৃদয়ের চিত্রকেই তুলে ধরেছেন। নামী জাতিতে তার সৃষ্টি শক্তি কেন্দ্রভুত রয়েছে। মাতৃরূপে ঈশ্বরকে সাধনা সহজ। মায়ের কাছে সন্তানদের লক্ষ দাবি। স্নেহময়ী জননী সন্তানের বহু গঞ্জনা সহ্য করেও অসহায় সন্তানকে মমতায় কোলে তুলে সোহাগে জড়িয়ে ধরেন। স্রষ্টা আর সৃষ্টির মাঝে নিবিড় সম্পর্ক অনুভব করার জন্যই শ্রী চন্ডীতে মাতৃরূপা ঈশ্বরার বন্দনা করা হয়েছে। কুমারী পূজা এক জলন্ত প্রমাণ।

নারী জাতিতে তার সৃষ্টি শক্তি কেন্দ্রভুত। মহামায়া যোগেশশ্বরী যোগমায়া বিশ্ব ব্যাপীনী হলেও নারী মূর্তিতে তার প্রকাশ। পুরানে বলা হয়েছে, সৃষ্টির আদিতে পরম পুরুষ নিজের লীলা বিস্তার করার জন্য নিজেকে নারী পুরুষ দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন। জগন্মাতাকে আমরা শুধু মাতৃভাবে নয়, কন্যাভাবেও বরণ করি। দেবতাদের তেজ থেকে মহামায়ার সৃষ্টি। দেবতাদের মঙ্গলের জন্যই তিনি মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। অশুভ শক্তিকে ধ্বংস করে শুভ শক্তির জয় হয়। মহিষাসুর অশুভ শক্তির প্রতীক। তম গুণের অধিকারী। মানুষের মাঝে যতক্ষণ পর্যন্ত তম গুণ বিরাজ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি বা মঙ্গল কামনা বৃথা। ভারতবর্ষে বর্ণে বর্ণে, গোত্রে গোত্রে হিংসা, যুদ্ধ, হত্যা চলছিলো। কিছুতেই সে হিংসার আগুন নেভানো সম্ভব নয়। তাই সে সময় রাজা কংস নারায়ণ তার রাজ্যের সকল সম্প্রদায়কে নিয়ে মহামঙ্গল কামনায় দুর্গা করেছিলেন। সেই থেকে ভারতবর্ষে দুর্গাপূজা প্রচলিত হয়। নিষ্ঠাবান হিন্দু আজও প্রতিদিন শ্রী শ্রী চন্ডী গ্রন্থ পাঠ করেন মঙ্গল কামনায়।

"সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে এম্বকে গৌরি নারায়ণে নমোহস্তুতে।"

শ্রীচন্ডী দুর্গা কারো মাতা, কারো কন্যা, কারো ভগ্নিরূপে শরতের শিউলী ফুটার স্পর্শ গন্ধ ছড়ায়ে ধুলার ধরণীতে আসেন। বাংলা-বাঙ্গালীর ঘরের কন্যা যেমন তার স্বামীগৃহ থেকে পিত্রালয়ে মাত্র কয়েক দিনের জন্য নায়র আসে। ঠিক তেমনই দুর্গা আসেন তার সন্তানদের নিয়ে। বাপের বাড়ি বেড়াতে ৭ম, ৮ম, ৯ম তিনদিন কত আনন্দ। কিন্তু দশমীর দিন করুণ বিদায়ের সুর বেজে উঠে। প্রিয় ভক্তদের চোখের কোণে অশ্রু জমে ওঠে। পিতামাতা তার দুলালী কন্যাকে কিছুতেই বিদায় দিতে চায় না। দুলালীকে তো রাখাও যায় না। তাই অবশেষে আঁচলে অশ্রু মুছে তাকে বিদায় দিতে হয়। বাঙ্গালী হিন্দুদের দুর্গাপূজা সর্বজনীন। ছোট বড় সবাই এ পূজায় মহামিলনে মেতে উঠে। এখানে সবাই সবার একান্ত আপন হয়ে যায়। চন্ডীর মধ্যে রূপকের সাহায্যে গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বর্ণিত। তা অনুসরণ করাই আমাদের কর্তব্য। কারণ মানুষের হৃদয়ের মাঝে সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তির যুদ্ধ সর্বদাই চলছে। মহাশক্তি জ্ঞানময়ী দুর্গার স্মরণ নিয়ে তিনি (দুর্গা) আমাদের অসৎ প্রবৃত্তিগুলো জাগ্রত করেনা। শ্রী শ্রী চন্ডীতে দেবতা ও অনুসরদের সাথে বর্ণিত সমর (যুদ্ধ) প্রকৃতপক্ষে সাধণ সমর। মানুষের কাম ক্রোধ, লোভ মোহকে কুল কুন্ডলিনী শক্তির সাহায্যে জয় করতে হয়। কামনা বাসনার ওপর থেকে সম্পূর্ণ বিরত না হলে, মহামুক্তির সন্ধান মিলে না। মহামুক্তির প্রত্যাশায় দুর্গাপূজার মহা আয়োজন। তাই দুর্গাপূজা বাঙ্গালী হিন্দুর জাতীয় মহোৎসব।

লেখক : রণজিৎ মোদক
শিক্ষক, সাংবাদিক ও কলামিস্ট
সাবেক সভাপতি, ফতুল্লা রিপোর্টার্স ক্লাব
সহ-সভাপতি, নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা
পূজা উদযাপন পরিষদ, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।

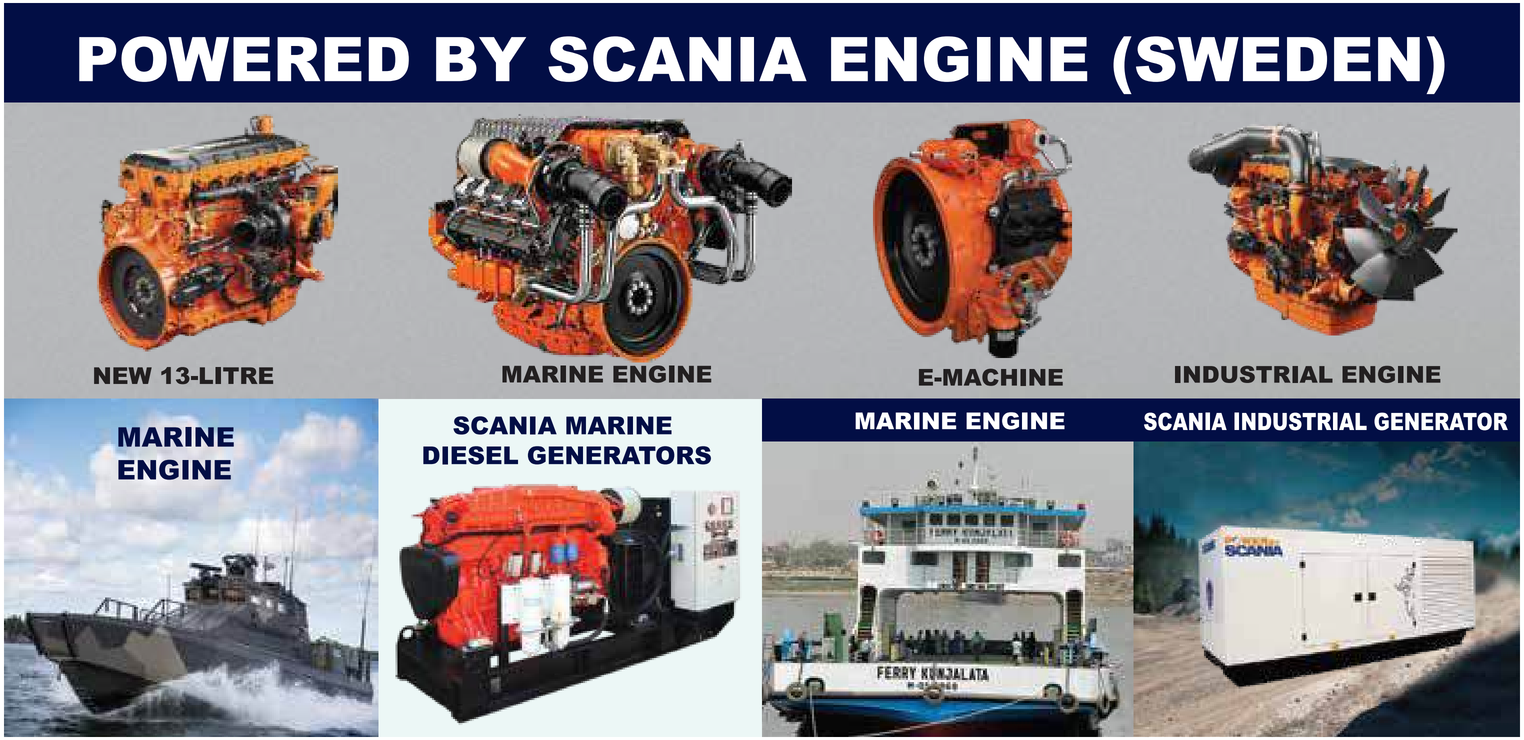

Authorized Dealer in Bangladesh

Euro Power BD Ltd.

Head office: House 366/9 Road No: 6 Baridhara DOHS
Dhaka-1206, Bangladesh

Registered office: Plot # 1/2 Dr. M. A. Rashid Road
Aouchpara (South), Tongi Gazipur-1711, Bangladesh

SCANIA

Please Contact: Hasan Mahmud, Mobile: +8801711596437, E-mail: hasan@europowerbd.com
Please Contact: Bipul Kanti Das, Mobile: +8801711521010, E-mail: bipul@europowerbd.com

দুর্গাপূজা

দীপক লাল কর্মকার

দুর্গাপূজা বা দুর্গোৎসব হল দেবী দুর্গার পূজাকে কেন্দ্র করে ভারত উপমহাদেশে প্রচলিত একটি হিন্দু উৎসব। এটি সারা বিশ্বে হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্বারা পালিত হয়, তবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম, ত্রিপুরা, ওড়িশা, ঝাড়খন্ড, উত্তর প্রদেশ (পূর্বাঞ্চল) এবং বাংলাদেশে ঐতিহ্যগত বিশেষভাবে উদযাপিত হয়। এটি বাংলা বর্ষপঞ্জির আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজা মূলত দশ দিনের উৎসব, যার মধ্যে শেষ পাঁচটি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। আশ্বিনের নবরাত্রির পূজা শারদীয় পূজা এবং বসন্তের নবরাত্রির পূজা বাসন্তিক বা বসন্তকালীন দুর্গাপূজা নামে পরিচিত। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে কলকাতার দুর্গাপূজা ইউনেস্কোর অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় যুক্ত করা হয়।

দুর্গাপূজা ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল সহ ভারতীয় উপমহাদেশ ও বিশ্বের একাধিক রাষ্ট্রে পালিত হয়ে থাকে। তবে সনাতনী বাঙালীর প্রধান উৎসব হওয়ার দরুন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যে ও বাংলাদেশে দুর্গাপূজা বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে প্রবাসী বাঙালি সনাতনীগণ ও স্থানীয় জনসাধারণ নিজ নিজ প্রথা মাফিক শারদীয়া দুর্গাপূজা বা নবরাত্রি উৎসব পালন করে। এমনকি পাশ্চাত্য দেশগুলোতে কর্মসূত্রে বসবাসরত বাঙালি হিন্দুরাও দুর্গাপূজা পালন করে থাকেন। ২০০৬ সালে গ্রেট ব্রিটেনের রাজধানী লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গ্রেট হলে "ভয়েসেস অফ বেঙ্গল" মরসুম নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীর অঙ্গ হিসেবে স্থানীয় বাঙালি সনাতনী অভিবাসীরা ও জাদুঘর কর্তৃপক্ষ এক বিরাট দুর্গাপূজার আয়োজন করেন।

সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠ থেকে দশম দিন পর্যন্ত শারদীয়া দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পাঁচটি দিন যথাক্রমে "দুর্গাষষ্ঠী", "দুর্গাসপ্তমী", "মহাষ্টমী", "মহানবমী" ও "বিজয়াদশমী" নামে পরিচিত। আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষটিকে বলা হয় "দেবীপক্ষ"। দেবীপক্ষের সূচনার অমাবস্যাটির নাম মহালয়া; এই দিন সনাতনীরা তর্পণ করে তাদের পূর্ব পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। দেবীপক্ষের শেষ দিনটি হল কোজাগরী পূর্ণিমা। এই দিন সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দেবী লক্ষ্মীর পূজা করা হয়। কোথাও কোথাও পনেরো দিন ধরে দুর্গাপূজা পালিত হয়। সেক্ষেত্রে মহালয়ার আগের নবমী তিথিতে পূজা শুরু হয়। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো যে, কালিকা পুরাণে বলা হয়েছে, অষ্টাদশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী উগ্রচণ্ডা তথা দশভুজার বোধন করা হবে কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে, ষোড়শভুজা ভগবতী ভদ্রকালীর বোধন করা হবে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে এবং চতুর্ভুজা ও দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী বিগ্রহের বোধন করা হবে যথাক্রমে শুক্ল প্রতিপদে এবং শুক্লা ষষ্ঠীতে। আবার মহাকাল সংহিতার বিধানে প্রতিমাভেদে উগ্রচণ্ডার কৃষ্ণনবম্যাদিকল্পে, ভদ্রকালীর প্রতিপদাদি কল্পে ও কাত্যায়নী দুর্গার ষষ্ঠ্যাদি কল্পে পূজার অনুষ্ঠান বিধেয়।

পশ্চিমবঙ্গ তথা বাংলাদেশ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যায় প্রচলিত "দুর্গোৎসব" মূলতঃ কালিকাপুরাণে বর্ণিত পদ্ধতি নির্ভর, তবে বলা হয়ে থাকে যে, বাংলায় দুর্গোৎসব মূলতঃ বৃহন্নন্দীকেশ্বর পুরাণ (যার অস্তিত্ব তর্কসাপেক্ষ), কালিকা ও দেবী পুরাণে বিধৃত রীতি অনুযায়ী তিনটি ভিন্নধারায় সম্পন্ন হয়। অনেক সময় আবার মহাকাল সংহিতায় বর্ণিত পদ্ধতির কদাচিৎ অনুসরণ করা হয়, যা তান্ত্রিক দুর্গোৎসব নামে পরিচিত। পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতির জন্য অবশ্য স্মার্ত রঘুনন্দনের দুর্গোৎসবতত্ত্ব ও তিথিতত্ত্বের অনুসরণ করা হয়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে বিদ্যাপতির দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী বা শূলপাণি রচিত দুর্গোৎসববিবেক প্রভৃতি স্মৃতিভাষ্য বা মহাকালসংহিতা/ কালীবিলাস তন্ত্র বর্ণিত পদ্ধতিরও অনুসরণ করা হয়। আবার বিহারে দুর্গোৎসব মূলতঃ দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী অনুসারে নিষ্পন্ন হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুর শহরের মৃন্ময়ী মন্দির এবং অনেক পরিবারে এই রীতি প্রচলিত আছে। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাতে দুর্গাসপ্তমী থেকে বিজয়াদশমী পর্যন্ত (শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দুর্গাসপ্তমী থেকে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা পর্যন্ত) চার দিন সরকারি ছুটি থাকে। বাংলাদেশে বিজয়াদশমীতে সর্বসাধারণের জন্য এক দিন সরকারি ছুটি থাকে।

পারিবারিক স্তরে দুর্গাপূজা প্রধানত ধনী পরিবারগুলোতেই আয়োজিত হয়। কলকাতা শহরের পুরনো ধনী পরিবারগুলোর দুর্গাপূজা "বনেদি বাড়ির পূজা" নামে পরিচিত। পারিবারিক দুর্গাপূজাগুলোতে শাস্ত্রাচার পালনের উপরেই বেশি জোর দেওয়া হয়। পূজা উপলক্ষে বাড়িতে আত্মীয়-সমাগম হয়ে থাকে। অন্যদিকে আঞ্চলিক স্তরে এক একটি অঞ্চলের বাসিন্দারা যৌথভাবে যে দুর্গাপূজার আয়োজন করেন তা বারোয়ারি পূজা বা সর্বজনীন পূজা নামে পরিচিত। ভারতে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের সময় সর্বজনীন পূজা শুরু হয়। মূলতঃ দেবী দুর্গাকে মাথায় রেখেই দেশমাতা বা ভারতমাতা বা মাতৃভূমির জাতীয়তাবাদী ধারণা বিপ্লবের আকার নেয়। দেবী দুর্গার ভাবনা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বন্দে মাতরম গানটি রচনা করেন যা ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র। সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদী নেতারা বিভিন্ন সর্বজনীন পূজার সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। এখন সর্বজনীন পূজায় "থিম" বা নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক মণ্ডপ, প্রতিমা ও আলোকসজ্জার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। থিমগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করে বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে "শারদ সম্মান" নামে বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হয়। এছাড়া বেলুড় মঠ সহ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন শাখা কেন্দ্র এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘের বিভিন্ন কেন্দ্রের সন্ন্যাসীরা দুর্গাপূজার আয়োজন করেন। তবে, ঝাড়খণ্ডের নিকটবর্তী পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ির চা-বাগানে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসকারী অসুর জাতিগোষ্ঠীর সদস্যরা এই সময়টা শোক হিসেবে পালন করে।

বাংলায় প্রথম দুর্গাপূজার সূচনা

প্রচলিত মত হল, বাংলায় প্রথম দুর্গাপূজা করেন নদীয়ার (এখন রাজশাহী জেলার) তাহেরপুরে রাজা কংস নারায়ণ রায় বাহাদুর। সালে পূজা শুরু হয়। কথিত আছে সেই সময় এই পূজায় কংস নায়রাণ ৮-৯ লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন। তিনি কংস নারায়ণ মন্দির ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। রাজকীয় অনুষ্ঠান করার ইচ্ছায় কংসনারায়ণ মহাযজ্ঞ করার সিদ্ধান্ত নেন। রাজপুরোহিত ছিলেন নাটোর বাসুদেবপুরের ভট্টাচার্য বংশের পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী। বংশানুক্রমে কংসনারায়ণ পশুবলি-বিরোধী বলে অশ্বমেধ বা গোমেধ যজ্ঞ করা যাবে না বলে দুর্গাপূজা শুরু করেন। আর একটি দাবী মতে, তারও আগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর (১৪৮৬-১৫৩৪) প্রধান শিষ্য নিত্যানন্দ খড়দহে স্বগৃহে প্রতিমায় দুর্গোৎসব করেছিলেন। আর একটি মতে কনৌজের পাঁচ কুলীন ব্রাহ্মণের এক ব্রাহ্মণ সুধানিধির বংশকে ঘোষাল উপাধি দেন বাংলার শাসক লক্ষণ সেন। ১৪৫০ সালে সেই সুধানিধি বংশের আশুতোষ ঘোষাল কোন্নগরে আসেন। সেই ঘোষাল বংশের পারিবারিক নথি অনুসারে, কোন্নগরের বাড়িতে ১৪৫৪ সালে বাংলায় প্রথম দুর্গাপূজার সূচনা হয়। আরো একটি মতে ১৫০৭ সালে

চন্দননগরের খলিসানির বসু বাড়িতে করুণাময় বসু দুর্গাপূজার প্রবর্তন করে। সেই দুর্গাপূজারর বিস্তৃতি ছড়ায় সেই বংশের রামকমল বসুর আমলে। পর্তুগিজদের সঙ্গে ব্যবসা করতেন বলে তাঁকে বলা হতো ফিরিঙ্গি কমল বসু। রামকমল বসুর নামে আপার চিৎপুর রোডের (বর্তমানে রবীন্দ্র সরণি) বাড়িতে এখন বর্তমানে মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান নামে হাসপাতাল রয়েছে। আরও একটি দাবী মতে, বাংলায় সবার আগে মাটির মূর্তিতে দুর্গাপূজা হয়েছে বাকুড়ার বিষ্ণুপুরের মৃন্ময়ী মন্দিরে। তখন মল্লভূমের রাজধানী প্রদ্যুম্ননগরে ছিল। রাজা জগৎমল্ল (রাজত্বকাল ৯৯৪ থেকে ১০০৭) ছিলেন এই বংশের ১৯তম রাজা। লোকশ্রুতি মতে প্রদ্যুম্ননগর থেকে রাজধানী বিষ্ণুপুরে সরিয়ে আনেন এবং রাজা জগৎমল্ল মৃন্ময়ী দেবীর মূর্তি পূজা শুরু করেন।

মঠ ও মন্দিরের পূজা

কালীঘাট মন্দির

কালীঘাট মন্দিরের কালী প্রতিমা। এই প্রতিমাটিই দুর্গাপূজার সময় চামুণ্ডা দুর্গা রূপে পূজিত হয়।

কলকাতার কালীঘাট মন্দিরে শারদীয়া দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজা কবে শুরু হয়েছিল, তা জানা যায় না। এই পূজার বিশেষত্ব হল, এখানে দুর্গা প্রতিমা আনা হয় না। মন্দিরের গর্ভগৃহে স্থাপিত দেবী কালীর মূর্তিকেই দুর্গার মন্ত্রে চামুণ্ডা দুর্গা রূপে পূজা করা হয়। পূজা হয় কালিকা পুরাণ মতে। দুর্গাষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যায় মন্দির চত্বরের মনসাতলায় বেল গাছ পুঁতে সেখানে বোধন হয়। মহাসপ্তমীর সকালে নবপত্রিকা স্নানের মাধ্যমে পূজা শুরু হয়। কালীঘাট মন্দিরে কালী মূর্তির দুই পাশে দুটি নবপত্রিকা রাখা হয়। মূর্তির ডানদিকের নবপত্রিকাটি সেবায়েতদের পক্ষ থেকে এবং বাঁদিকেরটি সেবায়েতদের গুরুদের পক্ষ থেকে বসানো হয়। মহাষ্টমী ও মহানবমী তিথিতে কুমারী পূজা করা হয়। মহানবমীতে বলিদান হয়। এই দিনে বলিদান মন্দিরের পুরোহিত ছাড়া কাউকে দেখতে দেওয়া হয় না। মন্দিরের সব দরজা বন্ধ করে বলি দেওয়া হয়। দুর্গাপূজার সময় কালীঘাট মন্দিরে বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা করা হয়। মহানবমীর রাতে পান্তা ভাত দিয়ে ভোগ দেওয়ার রীতি আছে। বিজয়াদশমীর দিন সিঁদুরখেলা হয়। এই সময় মন্দিরে পুরুষদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। এই দিনই নবপত্রিকা বিসর্জনের মাধ্যমে মন্দিরের দুর্গাপূজার সমাপ্তি ঘটে। দুর্গাপূজা উপলক্ষে বহু মানুষ কালীঘাট মন্দিরে আসেন ও পূজা দেন। কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে এই সময় মন্দিরের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ পুলিশ বাহিনী নিয়োগ করা হয়।

বেলুড় মঠ

বেলুড় মঠের দুর্গা প্রতিমা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান কার্যালয় বেলুড় মঠের অন্যতম প্রধান উৎসব হল শারদীয়া দুর্গাপূজা। ১৯০১ সালে স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গাপূজা করেন। সারদা দেবী এই দুর্গাপূজার সময় মঠে উপস্থিত ছিলেন। সারদা দেবী এর পরেও কয়েক বার বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা দেখতে এসেছিলেন। বেলুড় মঠে দুর্গাপূজার সময় কলকাতার কুমারটুলি থেকে প্রতিমা নিয়ে আসা হতো। বর্তমানে মঠ প্রাঙ্গনেই প্রতিমা তৈরি হয়। এখানে বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ মতে পূজা হয়। এই পূজার একটি বৈশিষ্ট্য হল, পূজার সঙ্কল্প এখনও সারদা দেবীর নামেই হয়ে থাকে। ১৯০১ সাল থেকেই কুমারী পূজা বেলুড় মঠের দুর্গাপূজার একটি অঙ্গ।

বেলুড় মঠের দুর্গাপূজার সূচনা হয় জন্মাষ্টমীর দিন। এই দিন কাঠামো পূজা হয়। এরপর মূর্তি নির্মিত হলে, দুর্গাষষ্ঠীর আগের দিন স্থানীয় জগন্নাথ মন্দির থেকে শালগ্রাম শিলা নিয়ে আসা হয়। এরপর দুর্গাষষ্ঠী থেকে বিজয়াদশমী পর্যন্ত সাধারণ শাস্ত্রবিধি অনুসারে পূজা হয়। বিজয়াদশমীর দিন সন্ধ্যায় মঠের ঘাটেই গঙ্গায় প্রতিমা বিসর্জন হয়। বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা দেখার জন্য প্রতিদিন প্রচুর জনসমাগম হয়। সরকারি ও বেসরকারি পরিবহন সংস্থাগুলি এই উপলক্ষে দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষ যানবাহনের ব্যবস্থা করে। বেলুড় মঠ ছাড়াও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যান্য শাখাকেন্দ্রেও পরে দুর্গাপূজা শুরু হয়েছে।

বিষ্ণুপুর মৃন্ময়ী মাতা, বিষ্ণুপুর ও মৃন্ময়ী মন্দির

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর শহরের মৃন্ময়ী মন্দির রাজ্যের একটি অন্যতম প্রধান দুর্গামন্দির। এই মন্দিরটি স্থাপিত হয়েছিল ৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে। এখানে দুর্গার দশভুজা মূর্তি "মৃন্ময়ী" নামে পূজিত হয়। মৃন্ময়ী মল্লভূমের রাজপরিবারের কুলদেবী। মৃন্ময়ী মন্দিরের শারদীয়া দুর্গাপূজা ১৮ বা ১৯ দিন ধরে চলে। মহালয়ার আগের নবমীতে জীমূতবাহন পূজা হয়। ওই দিন "বিল্ববরণ" নামে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। দুর্গাপূজার সময় তিনটি বিশেষ পট রাজবাড়ি মন্দিরে আনা হয়। এগুলির নাম হল বড় ঠাকুরানি, মাইতো ঠাকুরানি ও ছোটো ঠাকুরানি বা পটেশ্বরী। জিতাষ্টমীর পরদিন বড় ঠাকুরানি নামের পটটি মন্দিরে আনা হয়। দুর্গাষষ্ঠীর আগের চতুর্থীর দিন মাইতো ঠাকুরানি নামের পটটি মন্দিরে এনে পূজা করে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। মহাসপ্তমীর দিন মাইতো ঠাকুরানি ও ছোটো ঠাকুরানিকে এক সঙ্গে মন্দিরে আনা হয়। ছোটো ঠাকুরানির পটটি সোনার তৈরি। মহাসপ্তমী থেকে যথানিয়মে পূজা হয়। তবে এই পূজায় পশুবলি দেওয়া হয় না। মহাষ্টমীর দিন রাজবাড়ি থেকে রাজবাড়ির গৃহদেবী বিশালাক্ষীর অষ্টাদশভুজা অষ্টধাতুর মূর্তিটি মন্দিরে আনা হয়। সন্ধিপূজার সময় তোপধ্বনি করা হয়। মহানবমীর দিন রাতে খচ্চরবাহিনী পূজা নামে একটি বিশেষ পূজা হয়। এই পূজা দুজন পুরোহিত ছাড়া আর কাউকে দেখতে দেওয়া হয় না। মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী ও মহানবমীর

দিন একান্ন পীঠশক্তির বিশেষ পূজা এই মন্দিরের দুর্গাপূজার একটি বৈশিষ্ট্য। দশমীর দিন ঘটবিসর্জন, দীপদান, অপরাজিতা পূজা ও রামচন্দ্র পূজা হয়। দ্বাদশীর দিন মাঝরাতে রাবণকাটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পূজা শেষ হয়।

নতুন দিল্লি কালীবাড়ি

নতুন দিল্লি কালীবাড়ির দুর্গাপূজা দিল্লি শহরের সবচেয়ে পুরনো দুর্গাপূজাগুলির একটি। পূজাটি শুরু হয়েছিল ১৯২৫ সালে। সেই সময় পূজা হতো বার্ড রোডের (অধুনা বাংলা সাহিব রোড) আদি মন্দিরে। স্থানীয় বাঙালি অধিবাসীরা পূজার সময় মন্দিরে আসেন। ১৯৩১ সালে নতুন মন্দিরটি তৈরি হলে সেখানেই দুর্গাপূজার আয়োজন শুরু হয়। কালীবাড়ির পূজা হয় সার্বেকি রীতি অনুযায়ী। দুর্গাপ্রতিমাটি হয় একচালার প্রতিমা এবং শোলার সাজবিশিষ্ট। ১৯৩৬ সাল থেকে পূজার ব্যাপারে কিছু নির্দিষ্ট আচার মেনে চলা হচ্ছে। পূজা উপলক্ষে রবীন্দ্রসংগীত ও আবৃত্তির প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। কলকাতার শিল্পীরা মণ্ডপ তৈরি করে।

কাশ্মীরি গেটের অন্য পূজাটি পরিচালিত হয় দিল্লি দুর্গাপূজা সমিতির দ্বারা। এটি ১৯১০ সাল থেকে চলে আসছে। তিমারপুর অ্যান্ড সিভিল লাইনস পূজা সমিতির পূজাটি তিমারপুরে চলছে ১৯১৪ সাল থেকে।

ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির দেশের প্রধান মন্দির। এই মন্দিরটি খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত। এটি একটি দুর্গামন্দির এবং এখানেও মহাসমারোহে শারদীয়া দুর্গাপূজা আয়োজিত হয়। পূজার সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী সহ বিরোধী দলনেতা, সাংসদ ও বিখ্যাত ব্যক্তিরা এই মন্দির পরিদর্শনে আসেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ এই মন্দির দর্শনে আসেন। পূজায় ভোগ খাওয়ানো হয়। বিজয়াদশমীতে পার্শ্ববতী প্যারেড গ্রাউন্ডে বিজয়া সম্মেলনী হয়। এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সংগীত ও চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট শিল্পীরা উপস্থিত থাকেন।

শারদীয় দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা

দৈনিক **স্বদেশ বিচিত্রা** পড়ুন

বিজ্ঞাপন দিন।

অশোক ধর
সম্পাদক

দৈনিক স্বদেশ বিচিত্রা

১৫১, মতিঝিল সি/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
মোবাইল: ০১৮১৮-২১৪৭৫১, ০১৬৭৯-২৮৩৮৫৮
ই-মেইল: dailyswadeshbichitra@yahoo.com
ওয়েব সাইট: www.dailyswadeshbichitra.com
www. epaper.dainikswadeshbichitra.com

দুর্গাপূজা ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তপন সান্যাল

কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ১৭৮৪ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষ নীলমণি এই দুর্গাপূজা শুরু করেন। দুর্গাপূজা প্রধানত ধনী পরিবার গুলোতেই আয়োজিত হতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৩ সালে বোলপুর থেকে কাদম্বরী দেবীকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর মতবাদ লিখেছিলেন। তার মতে, ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার দুই-ই। শুধু ঈশ্বর নয়, তাঁর মতে আমরা প্রত্যেকেই সাকার এবং নিরাকার দুই-ই। তিনি ঈশ্বরবাদ নিয়ে কোনও বাদ-বিবাদে যেতে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি আকারে, রূপে, কর্মে ঈশ্বরের উপাসনা করাতেই বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মূর্তি পূজা করতে চাইতেন না। তবে প্রতিমা নিয়ে তাঁর কোনও দ্বিমত ছিল না। তাঁর মতে, যদি কোনও বিশেষ মূর্তির মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাবকে বিশেষ সত্য বলে না মনে করা যায় তাহলেই তাতে আর কোনও সমস্যা থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোন সৌদামিনী দেবীর একটি লেখা থেকে জানা যায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পূজার বাড়িতে থাকতেন না। পূজার সময় ঠাকুরবাড়িতে যত আচার-অনুষ্ঠানই হোক না কেন সেখানে রবিঠাকুরের মা স্বামীকে ছাড়া কোনওভাবেই নিজেকে শামিল করতে পারতেন না। ষষ্ঠীর দিন শুধু ছেলে-মেয়েরাই নয়, আত্মীয়-স্বজন, কর্মচারী, ভৃত্য এবং ঝিদের নতুন জামাকাপড় বিলি করে দেওয়া হতো ঠাকুরবাড়ি থেকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ দ্বারকানাথ অত্যন্ত উদার মনের মানুষ ছিলেন এবং তিনি প্রচুর খরচ করতেন। পূজার সময়ে মোয়া, ক্ষীর প্রভৃতি মিশিয়ে ফুটবলের মতো দেখতে একটি বৃহদাকার মিঠাই তৈরি করা হতো সবার জন্য।

রবীন্দ্রনাথের মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেকালের ঠাকুরবাড়ির দুর্গোৎসব প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, পূজার দিনগুলোতে তাঁরা সন্ধ্যার দিকে দালানে যেতেন। সেখানে ধূপ জ্বালানো হতো। বিভিন্ন রকমের বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন বাদ্যযন্ত্রীরা। সন্ধ্যার আরতি দেখার জন্য এবং ঠাকুরকে প্রণাম করার জন্যই তাঁরা দালানে যেতেন। বিজয়ার দিন প্রতিমার নিরঞ্জনের মিছিলে ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা যোগ দিতেন। মহর্ষি-কন্যা সৌদামিনী দেবীর কথায়, ঠাকুরবাড়িতে যখন দুর্গোৎসব হতো তখন ছেলেরা বিজয়ার দিনে নতুন জামাকাপড় পরে প্রতিমার সঙ্গে যেত। আর মেয়েরা তখন তেতলার ছাদে উঠে প্রতিমা বিসর্জন দেখত।

সৌদামিনী দেবীর লেখায় এও জানা যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিজয়ার রাতে শান্তিজল সিঞ্চন ও ছোট-বড় সবার মধ্যে কোলাকুলি করাটা খুব পছন্দ করতেন।

এছাড়াও, সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন, বিজয়ার দিন তাঁদের বাড়িতে গৃহনায়ক বিষ্ণু আগমনী ও বিজয়ার গান করতে আসতেন। অবনীন্দ্রনাথের লেখা থেকে জানা যায়, বিজয়া তাঁদের জন্য খুব আনন্দের দিন ছিল। সেদিনও কিছু পার্বণী পাওয়া যেত। ঠাকুরবাড়ির যত কর্মচারী ছিলেন সবার সঙ্গে তাঁরা কোলাকুলি করতেন। বুড়ো চাকররাও এসে ঠাকুরবাড়ির ছোট-বড় সবাইকে প্রণাম করত। পরবর্তীকালে ঠাকুরবাড়িতে অনুষ্ঠিত "বিজয়া সম্মিলনী" প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের লেখায় জানা যায়, সেদিন ঠাকুরবাড়িতে মস্ত জলসা বসত। খাওয়া-দাওয়া হতো খুব। ওস্তাদ তানপুরা নিয়ে গানে গানে মাত করে দিতেন ঝাড়বাতির আলোয় আলোকিত সেই ঠাকুরবাড়ি। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মা দুর্গাকে খাঁটি সোনার গয়না দিয়ে সাজানো হতো এবং সালঙ্কার সেই প্রতিমাকে বিসর্জন দেওয়া হতো। প্রতিমা ভাসানোর সময়ও সেই স্বর্ণালঙ্কার খুলে নেওয়া হতো না। নৌকার মাঝি অথবা অন্য কর্মচারীরা পানিতে ঝাঁপ দিয়ে ওইসব গয়না তুলে আনত। কিন্তু সেই গয়না ফের ঠাকুরবাড়িতে নেওয়া হতো না।

তত্ত্বাবোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ১০ বছর পরও ঠাকুরবাড়িতে দুর্গাপূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজা হতো। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ছোট ভাই নগেন্দ্রনাথের মতে, দুর্গোৎসব সমাজের সবার সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপনের একটি উৎকৃষ্ট উপায়। তাই সবার প্রতি তাঁর আহ্বান ছিল দুর্গোৎসব নিয়ে কোনও হস্তক্ষেপ না করার। সম্ভবত, রবীন্দ্রনাথের কাছে নিজের ছোট কাকার এই ধারণাই বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বেশকিছু প্রবন্ধে দুর্গা সম্পর্কে নানাভাবে আলোচনা করেছেন। "লোকসাহিত্য"-এর অন্তর্ভুক্ত "ছেলেভুলানো ছড়া" প্রবন্ধটিতে একটি বহু প্রচলিত ছড়া প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লেখা রয়েছে। সেখানে জানা যায়, আমাদের বাংলাদেশের এক কঠিন অন্তর বেদনা আছে, মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো। অল্পবয়স্ক মেয়েদের বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সংসার করতে হয়। আর মেয়ের এই ত্যাগের জন্য পুরো বাংলাদেশে সবারই হৃদয় কাঁদে। সেই করুণ স্নেহ বারবার শারদীয় দুর্গোৎসবে স্বর্গীয়তা লাভ করে। তাই রবিঠাকুর একে বাঙালির অম্বিকাপূজা অথবা বাঙালির কন্যাপূজা বলেছেন। আগমনী এবং বিজয়া হলো বাংলার মাতৃহৃদয়ের গান।

এই পূজা-পার্বণ যে সমাজের সব মানুষকে একত্র করে মিলনে বাঁধে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একমাত্র এ বিষয়টিই টেনেছে। তিনি সবসময় বোঝাতে চেয়েছেন মিলনের মধ্য দিয়ে অসীমকে পাওয়া যায়, কোনও দেবতাকে নয়। তিনি ছিলেন আপাদমস্তক অসাম্প্রদায়িক মানুষ। তাই দুর্গাপূজার সময়গুলোতে তিনি পূজার চেয়েও বেশি আনন্দ উপভোগ করতেন মানুষের মিলন মেলায় এসে।

দুর্গোৎসব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়ার মতো প্রথম কবিতা প্রকাশ হয় ১২৯১ (১৮৮৪ ইং)-এর কার্তিক মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচার পত্রিকায়। সেই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন দীর্ঘ কবিতায় আনন্দময়ীর আগমনে/ আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে/হেরো ওই ধনীর দুয়ারে/দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে। রবীন্দ্রনাথ 'পার্বণী' নামের শারদীয় বার্ষিকীতেই প্রথম পূজার লেখা দেন। 'পার্বণী' হলো প্রথম বাংলা বার্ষিকী। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২৫ সালে। 'পার্বণী' সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ছোট জামাই নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। 'পার্বণী'র প্রথম পূজাবার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথ 'শরতে আজ কোন্ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে' গানটি 'শরতের গান' নাম দিয়ে লিখেছিলেন। ১৯৩৫ সালে 'আনন্দবাজার' ও 'দেশ' পত্রিকার পক্ষ থেকে পূজা সংখ্যায় লেখা দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথকে 'একশো টাকা বায়না' দেওয়া হয়। ঘটনাটির উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৫ সালের ২৯ আগস্ট শান্তিনিকেতন থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখেন, 'এখানকার বন্যা পীড়িতদের সাহায্যার্থে অর্থসংগ্রহ-চেষ্টায় ছিলুম। ব্যক্তিগতভাবে আমারও দুঃসময়। কিছু দিতে পারছিলুম না বলে মন নিতান্ত ক্ষুব্ধ ছিল। এমন সময় দেশ ও আনন্দবাজারের দুই সম্পাদক পূজার সংখ্যার দুটি কবিতার জন্যে একশো টাকা বায়না দিয়ে যান, সেই টাকাটা বন্যার তহবিলে গিয়েছে। আগেকার মতো অনায়াসে লেখবার ক্ষমতা এখন নেই। সেইজন্যে 'বিস্ময়' কবিতাটি দিয়ে ওদের ঋণশোধ করব বলে স্থির করেছি। ক্লান্ত কলম নতুন লেখায় প্রবৃত্ত হতে অসম্মত।' শারদীয় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের লেখা পাওয়ার জন্য সম্পাদকের চেষ্টার অন্ত থাকত না।

আসলে পথে ঘাটে যে উমারা বঞ্চিত হচ্ছে বিভিন্ন যন্ত্রনায় উনি সেই দিকটা গুরুত্ব দিয়েছেন অনেক বেশি, মূর্তি উৎসবে নয়, কারণ এটা শুধু নয় তিনি ব্রাহ্ম, এটাই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন মানবতা বা মনুষ্যত্ব একমাত্রই কাম্য এবং প্রয়োজন যে কোনও ঠাকুর পুজোর উৎসবের চেয়ে। কারণ দুর্গারা ছড়িয়ে আছে আমাদেরই সমাজ জীবনের বিভিন্ন প্রান্তে। তাই দুর্গা একই সাথে নিরাকার ও সাকার।

Western Union
বাজলো ঢোল বাজলো ঢাক
মা চলে এলোরে
খুশিতে আজ সাজারে সাজ
মায়ের ওই চরণে
ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন-এর পক্ষ থকে সবাইকে
শারদীয় দূর্গাপূজার শুভেচ্ছা

ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপূজা

ড. নিখিল চন্দ্র সরকার

বাঙালি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। দুর্গাপূজা সমগ্র হিন্দুসমাজেই প্রচলিত। তবে বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় এর প্রচলন বেশি দেখা যায়। আশ্বিন ও চৈত্র মাসে দুর্গাপূজা পালিত হয়। আশ্বিন মাসের দুর্গাপূজা শারদীয় দুর্গাপূজা এবং চৈত্র মাসের দুর্গাপূজা বাসন্তী দুর্গাপূজা নামে পরিচিত। শারদীয় দুর্গাপূজার জনপ্রিয়তা বেশি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়কালে দুর্গাপূজা কেমন হতো সেটাও জানা যেতে পারে বৈকি।

বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় এই উৎসব বহু আগে থেকেই পালিত হয়ে আসছে। মহালয়া থেকে শুরু করে বিজয়া দশমী পর্যন্ত সব আনুষ্ঠানিকতা। দুর্গাপূজার বিশেষ আনন্দ-উদযাপনে ঠাকুরবাড়িও ব্যতিক্রম ছিল না। বেশ ধুমধামের সঙ্গেই বাড়ির সবাই মিলে দুর্গাপূজা করতেন। কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ১৭৮৪ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষ নীলমণি এই দুর্গাপূজা শুরু করেন। দুর্গাপূজা প্রধানত ধনী পরিবারগুলোতেই আয়োজিত হতো।

সর্বশেষ খবর দ্য ডেইলি স্টার বাংলার গুগল নিউজ চ্যানেলে

বনেদি বাড়ির পূজা বলে একটি কথা আছে; কলকাতার ধনী পরিবারের পূজার ইতিহাস থেকেই তা এসেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মসূত্রেই ছিলেন জমিদার। তাঁদের বাড়ির সব পূজা-উৎসবই হতো অনেক জাঁকজমকপূর্ণ।

যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গতানুগতিক নিয়মে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করেননি। অনন্তের চৈতন্যই ছিল তাঁর সব কাজকর্ম ও ধ্যান-ধারণাজুড়ে। তিনি নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ঘর এবং গৃহকর্মের মধ্যেই ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছিলেন। কবিগুরু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, উৎসবের দিন একলার ঘর হয়ে ওঠে সবার ঘর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৩ সালে কলকাতার বোলপুর থেকে কাদম্বিনী দেবীকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর মতবাদ লিখেছিলেন। তার মতে, ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার দুই-ই। শুধু ঈশ্বর নয়, তাঁর মতে আমরা প্রত্যেকেই সাকার এবং নিরাকার দুই-ই। তিনি ঈশ্বরবাদ নিয়ে কোনো বাদ-বিবাদে যেতে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি আকারে, রূপে, কর্মে ঈশ্বরের উপাসনা করাতেই বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মূর্তি পূজা করতে চাইতেন না। তবে প্রতিমা নিয়ে তাঁর কোনো দ্বিমত ছিল না। তাঁর মতে, যদি কোনো বিশেষ মূর্তির মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাবকে বিশেষ সত্য বলে না মনে করা যায় তাহলেই তাতে আর কোনো সমস্যা থাকে না।

সূত্র ঃ ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত

অসাম্প্রদায়িক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

ড. নিখিল চন্দ্র সরকার

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক চেতনার সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্ব। অসাম্প্রদায়িকতা না থাকলে কোন মানুষ মানবিক গুণের অধিকারী হতে পারে না, অপরদিকে সংস্কৃতিমনাও হতে পারে না। বঙ্গবন্ধু ছিলেন এ দু'গুণের অধিকারী। তিনি কখনো হিন্দু মুসলিম বিভাজন পছন্দ করতেন না। কারণ জাতি বিরোধ থাকলে কোন জাতি উন্নত শিখরে উঠতে পারে না। ছোটবেলা থেকেই হিন্দু-মুসলিম একসাথে গান বাজনা, খেলাধুলা ও চলাফেরা করতেন। তিনি ১৯৪৬ সালে কলকাতায় অধ্যয়নরত থাকা অবস্থায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলাকালীন দাঙ্গা প্রতিরোধে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে খুবই পছন্দ করতেন। সঞ্চয়িতা সর্বদা তাঁর সংগে থাকত। বিভিন্ন সভায় তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিতেন। ১৯৭২ সালে ১০ই জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন ঐতিহাসিক জনসভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন- "সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধজননী/রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করোনি। তিনি আরো বলেছিলেন কবিগুরুর কথা আজ মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেছে কারণ আজ বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। বঙ্গবন্ধুর অনেক লিখনী ও বক্তব্যে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সাথে সাথেই পাকিস্তান সরকার রেডিও-টেলিভিশনে রবীন্দ্র সংগীত বন্ধ করে দেয়। তিনি এ ধরনের কার্যকলাপে কঠোর সমালোচনা করেন। বাঙালি সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর ভাষণে বলেছিলেন-

দেশের গণমুখী সংস্কৃতিকে বিকশিত করার উদ্দেশ্যে সাহিত্য-সঙ্গীতে কবি-সাহিত্যিক শিল্পীদের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখকে প্রতিফলিত করতে হবে। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। তাই মাটি ও মানুষকে কেন্দ্র করে গণমানুষের সুপ্ত শক্তি ও স্বপ্ন এবং আশা আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠবে বাংলার নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি। আপনারা ভালবাসা এবং শান্তির অনেক গান গেয়েছেন। আজ বস্তির নিঃস্ব সর্বহারা মানুষের জন্যে গান রচনার দিন এসেছে। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের মতো বিপ্লবী গান গাইতে হবে। মানুষের মনে প্রেরণা যোগাতে হবে। যদি এতে বাধা আসে, সেই বাধা মুক্তির জন্যে সাত কোটি বাঙালি এগিয়ে আসবে।

জনগণ যখন দেশের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করছিল, তখন এক শ্রেণির শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি গত ২৩ বছরে মৌলিক গণতন্ত্রের প্রশস্তি গেয়ে নিজেদের ভবিষ্যত গুছানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা কি আজ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে, তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন? কোন্ ৪০ জন ব্যক্তি রবীন্দ্র সংগীতের বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রদান করেছিলেন? রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের অস্তিত্বটা থাকে কোথায়? যে মৌলিক গণতন্ত্র ও ডিক্টেটরি শাসনের পতন ঘটাবার জন্যে বাংলার বীর ছাত্র-জনতা-শ্রমিক বুকের রক্ত দিয়েছে, তাদের গুণকীর্তন করে, প্রবন্ধ লিখে, বেতার কথিকা প্রচার করে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদ পয়সা রোজগার করেছেন।১

বঙ্গবন্ধু তাঁর জনসভায় শিল্পী অজিত রায়কে সভা শুরুতেই 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি গাইতে বলতেন। প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্গবন্ধু তখনই ঠিক করে রেখেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের এটিই হবে জাতীয় সংগীত। তখন সাধারণ মানুষ এ গানটি ধারণ করেছিলেন। স্বাধীনতার পর এটিই হয়েছে আমাদের জাতীয় সংগীত। ভারত থেকে শিল্পী-সাহিত্যিকরা বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলে খুবই আন্তরিকতার সাথে তিনি আলাপ করতেন। ভারতের বিভিন্ন শিল্পী বিভিন্ন সময়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাতের স্মৃতিচারন করতে গিয়ে তাঁর বিশাল হৃদয়, অন্তরের উষ্ণতার কথা উল্লেখ করেছেন।

বঙ্গবন্ধু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে হিন্দু-মুসুলমান যেন সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে এ ব্যাপারে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন। কলকাতা ও ব্যারাকপুরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু লিখেছেনঃ

সেদিন রবিবার ছিল। আমি সকালবেলা শহীদ সাহেবের বাসায় যাই। তিনি আমাকে বললেন, "চল, ব্যারাকপুর যাই। সেখানে খুব গোলমাল হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীও যাবেন।" আমি বললাম, যাব স্যার। তাঁর গাড়িতে উঠলাম, নারকেলডাঙ্গা এলাম। সেখান থেকে মহাত্মাজী, মনু গান্ধী, আভা গান্ধী ও তাঁর সেক্রেটারি এবং কিছু কংগ্রেস নেতাও সাথে চললেন। ব্যারাকপুরের দিকে রওয়ানা করলাম। হাজার হাজার লোক রাস্তার দু'পাশে ভিড় করছে, তাদের শুধু এক কথা, 'বাপুজী কি জয়'। ব্যারাকপুরে পৌঁছে দেখি, এক বিরাট সভার আয়োজন করা হয়েছে। মহাত্মাজী রবিবার কারও সাথে কথা বলেন না, বক্তৃতা তো করবেনই না। মনু গান্ধী ও আভা গান্ধী"আলহামদু" সূরা ও কুলহু সূরা পড়লেন। তারপরে রামবন্দনা গান গাইলেন। মহাত্মা গান্ধীজী লিখে

দিলেন, তার বক্তৃতা সেক্রেটারি পড়ে শোনালেন। সত্যই ভদ্রলোক জাদু জানতেন। লোকে চিৎকার করে উঠল, হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই। সমস্ত আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়ে গেল এক মুহূর্তের মধ্যে।২

আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের সর্বপ্রাচীন ও সর্ববৃহৎ দল। এ দলটি অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী। এ দলকে বারবার আঘাত করেছে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি। এ ঘৃণ্য তৎপরতা আজও অব্যাহত রয়েছে। বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জের ওয়াহিদুজ্জামান সাহেবকে দশ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছিলেন। ওয়াহিদুজ্জামান সাহেব কীভাবে মৌলবাদী শক্তিকে ব্যবহার করেছিলেন তা নিয়ে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

জনাব সাহেব [ওয়াহিদুজ্জামান] ও মুসলিম লীগ যখন দেখতে পারলেন তাদের অবস্থা ভালো না, তখন এক দাবার ঘুঁটি চালালেন। অনেক বড় বড় আলেম, পীর ও মওলানা সাহেবদের হাজির করলেন। গোপালগঞ্জে আমার নিজের ইউনিয়নে পূর্ব বাংলার এক বিখ্যাত আলেম মওলানা শামসুল হক সাহেব জন্মগ্রহণ করেছেন। আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে খুবই শ্রদ্ধা করতাম। তিনি ধর্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন। আমার ধারণা ছিল, মওলানা সাহেব আমার বিরুদ্ধাচরণ করবেন না। কিন্তু এর মধ্যে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করলেন এবং আমার বিরুদ্ধে ইলেকশনে লেগে পড়লেন। ঐ অঞ্চলের মুসলমান জনসাধারণ তাকে খুবই ভক্তি করত। মওলানা সাহেব ইউনিয়নের পর ইউনিয়নে স্পিডবোর্ড নিয়ে ঘুরতে শুরু করলেন এবং এক ধর্মসভা ডেকে ফতোয়া দিলেন আমার বিরুদ্ধে যে, 'আমাকে ভোট দিলে ইসলাম থাকবে না, ধর্ম শেষ হয়ে যাবে।' সাথে শর্ষিনার পীর সাহেব, বরগুনার পীর সাহেব, শিবপুরের পীর সাহেব, রহমতপুরের শাহ সাহেব সকলেই আমার বিরুদ্ধে নেমে পড়লেন এবং যত রকম ফতোয়া দেওয়া যায় তাহা দিতে কৃপণতা করলেন না।৩

বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সালে ৬ দফা নামে এক মহামুক্তি সনদ এ দেশবাসীর সামনে উপস্থাপন করেন-

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আইনি কাঠামোর বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে ৬ দফাই ছিল বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের সুস্পষ্ট মহাসনদ। ওই ৬ দফার ভিত্তিতেই পরবর্তীকালে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বহু স্রোতধারায়। বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত সুচিন্তিত ও বাস্তবসম্মতভাবেই ধর্মীয় আনুগত্য ও বিশ্বাসের সাযুজ্যের অজুহাতে বাঙালি মসুলমানকে 'আতরাফ' আর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকবর্গ ও তাদের সুবিধাভোগীদের সুকৌশলে 'আশরাফ' মর্যাদায় অভিষিক্ত রাখার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রামের পথরেখা নির্মাণ করেন। যার গভীর এবং ব্যাপক ও জোরালো প্রকাশ ঘটে ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে। ওই অবিসংবাদী ৬ দফার চেতনার স্বপক্ষে এদেশের আপামর জনতার নিরঙ্কুশ রায়ে কেঁপে ওঠে বৈষম্য ও বিমাতাসুলভ আচরণের পাটাতন, যার নাম মুহাম্মদ আলি জিন্নাহর ওই দ্বিজাতিতত্ত্ব ও পাকিস্তান রাষ্ট্র। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পূর্ববাংলার জনসাধারণ এই ব্যাপক ও ধস নামানো নির্বাচনী রায়ের মাধ্যমে দেখিয়ে দিল, ধর্ম, জাতিগত অহমিকা কোন গোষ্ঠী বা ব্যক্তিবিশেষের একচেটিয়া ক্ষমতা প্রদর্শনের বিষয় নয়। জাতীয়তা ও ধর্মীয়তা ইতিহাসের দৃষ্টিকোণে যুগে-যুগে, ভূখণ্ডে-ভূখণ্ডে, জাতিতে-জাতিতে সম্পূর্ণ আলাদা-আলাদা অবয়বে বিপুল গৌরবে বিদ্যমান থাকতে দেখা গেছে। যেখানে গভীর চাতুর্থপূর্ণ রাজনৈতিক আধিপত্য ফলপ্রসূ প্রভাব বিস্তারে বরাবরই ক্ষতি মেনেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। তারই উজ্জ্বল এবং বিস্ফোরক অভিব্যক্তি দেখা গেল ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে এবং স্বাধীনতা অর্জনের সোনালি অর্জনে।৪

ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রয়াত প্রণব মুখার্জি তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন-

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের কীভাবে উন্নতি ঘটানো যায়, সেই প্রসঙ্গে মুজিব একবার তাঁর আত্মজীবনীতে সুভাষ চন্দ্র ও চিত্তরঞ্জন দাশকে উল্লেখ করে বলেন, বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের ও বিপ্লবীরা, যারা দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, তাঁরা যদি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি এবং বিশেষ করে, হিন্দু বেনিয়া কুশীজীবী জমিদার জোতদারদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতেন, তাহলে অবিভক্ত বাংলায় যেভাবে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ সৃষ্টি হয়ে পাকিস্তান তৈরিতে সাহায্য করেছিল, তা সম্ভব হতো না।

বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আবদুল গফফার চৌধুরী লিখেছেন-

যারা বঙ্গবন্ধুর কাছে একবার গেছেন তাঁরাই স্বীকার করেছেন, কোমলতা-কঠোরতায় মিশিয়ে অদ্ভুত যাদুকরী আকর্ষণ তাঁর ব্যক্তিত্বে। তিনি শিশুর মতো সরল, সাহসে অনমনীয়, প্রয়োজনে বজ্রের মতো কঠোর, সেই সাথে মিশেছে দুর্জয় মনোবল, নিজের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা। তিনি চরিত্রে জাতীয়তাবাদী, স্বভাবে গণতন্ত্রী বিশ্বাসে সমাজতন্ত্রী এবং আদর্শে ধর্মনিরপেক্ষ। তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদের তিনি উদ্যোক্তা, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা, অর্থনীতির প্রবক্তা এবং সেই সাথে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রাদর্শের অনুসারী।৫

নির্মলেন্দু গুণ তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন-

শেখ মুজিব, প্রকারান্তরে বাঙালি চরিত্রের সাম্প্রদায়িকতাজাত

হীনম্মন্যতাকে অতিক্রম করতে চেয়েছিলন। তিনি চেয়েছিলেন বাঙালিকে 'মানুষে' পরিণত করতে। তাই পাকিস্তানের কারাগার থেকে তাঁর স্বাধীন স্বপ্নের দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সোহরাওয়াদী উদ্যানের বিশাল জনসভায় তিনি বলেছিলেন, 'আজ আমি মুক্ত বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছি: আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা।'

১৯৭০-এর নির্বাচনে বিপুলভাবে বাঙালির ম্যান্ডেট পাওয়ার পর ৩ জানুয়ারি ১৯৭১ তারিখে সোহরাওয়াদী উদ্যানে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের যে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি হয়েছিল, সেখানে শেখ মুজিব যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেখানে তিনি স্পষ্টভাষায় বলেন, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ভাইয়েরা, আপনারা শুনে রাখুন- আপনারাও এ দেশের সমান নাগরিক। আপনাদের ওপর এ যাবত ক্ষেত্রবিশেষে অত্যাচার হয়েছে জানি। আমি আপনাদের এই আশ্বাস দিচ্ছি, আর আপনাদের ওপর অত্যাচার হবে না। এই দেশ একা কারো নয়, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের এই দেশ। ধর্মের নামে ব্যবসা চলবে না। শোষণ চলবে না। আমাদের লক্ষ্য একটি শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক দেশ প্রতিষ্ঠা, ধর্মনিরপেক্ষতাই হবে রাষ্ট্রীয় নীতি।

অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণেই তিনি চেয়েছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকা হাতে অগ্রসর হতে। এ শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন কবিগুরু এবং সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে। পেয়েছিলেন সিরাজউদ্দৌলা, সম্রাট আকবর এবং তাঁর সুফীসাধক পূর্বপুরুষের কাছ থেকে। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাংলা ভাষাভাষী সকল বাঙালিকে জাতিতৃষ্ণার এক রশিতে বেঁধে তাকে ক্রমশ মানুষে পরিণত করার আর কোন উপায় অবশিষ্ট আছে বলে মনে হয় না।৬

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য, একটি উন্নত জাতি গঠনের জন্য এবং শোষণমুক্ত অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠনের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি সম্পর্কে সাদু-সাঁই লোক সঙ্গীতকার, গায়ক, শত শত পীরও অসাম্প্রাদায়িক মানবিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। পরবর্তীতে সময়ে যুক্ত হয়েছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষ বসু, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও বেগম রোকেয়া। কবি সাহিত্যিকরা একই ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িকতার চর্চা করেছেন। অনেক উজ্জ্বল রাজনীতিকরা এসেছেন ও চলে গিয়েছেন, কিন্তু বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক, উজ্জ্বল গভীর বোধটি একমাত্র বঙ্গবন্ধুই উপলদ্ধি করেছিলেন। যার ফলে বাংলাদেশের সংবিধানে যুক্ত হয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। অনেক উচ্চ শিক্ষিত রাজনীতিকরা রাজনীতি চর্চা করছেন, কিন্তু বাঙালির রাজনৈতিক মন্ত্র বীজ ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক মানবতাবোধকে একমাত্র বঙ্গবন্ধুই মনের গহীনে উপলব্ধি করে- ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার এবং হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান- আমরা সবাই বাঙালি-এ বাণী উচ্চারণ করেছেন।

তথ্যসূত্রঃ

১. শেখ হাসিনা (সম্পাদক), জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি, ঢাকা, পৃ. ২২৯-২৩০।

২. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, পৃ.৮১।

৩. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, পৃ.২৫৬।

৪. হরেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদক), বঙ্গবন্ধুঃ জাতির পিতা যে বাংলাদেশ ছেয়েছিলেন, হাফিজ রশিদ খান, ঢাকা, পৃ. ১০০।

৫. হরেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদক), বঙ্গবন্ধুঃ বঙ্গবন্ধু, আবদুল গফফার চৌধুরী, ঢাকা, পৃ. ১৩৩।

৬. হরেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদক), বঙ্গবন্ধুঃ শেখ মুজিব: এক আত্মঘাতী জাতির নেতা, নির্মলেন্দু গুণ, ঢাকা, পৃ. ১৪৮ ও ১৪৯।

লেখক : সম্পাদক, অপরাজিতা, শারদ সংকলন, ৭ম সংখ্যা, ২০২৩

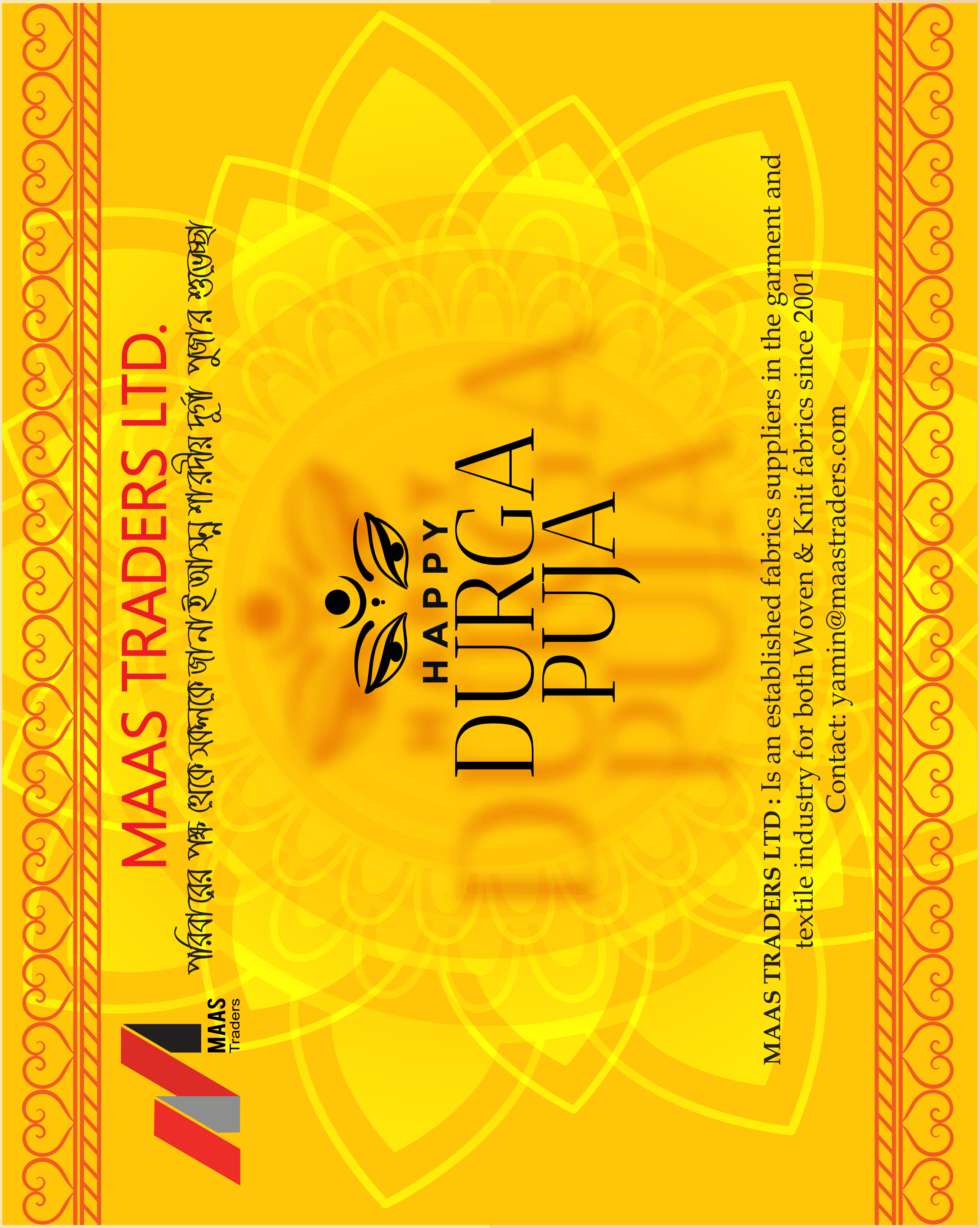
MAAS
Traders
MAAS TRADERS LTD.
পরিবারের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আসন্ন শারদীয় দুর্গা পুজার শুভেচ্ছা
HAPPY
DURGA
PUJA
MAAS TRADERS LTD : Is an established fabrics suppliers in the garment and textile industry for both Woven & Knit fabrics since 2001
Contact: yamin@maastraders.com

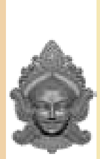

মহালয়া (মাতৃপক্ষ) কি?

প্রদীপ কুমার সাহা

মহালয়া: পিতৃপক্ষের শেষক্ষণ ও দেবীপক্ষের সূচনাকালের সময়কেই মহালয়া বলা হয়। প্রলয়কালে পৃথিবী এক বিরাট কারণ-সমুদ্রে পরিণত হলে শ্রীবিষ্ণু সেই সমুদ্রের উপর অনন্তনাগকে শয্যা করে যোগনিদ্রায় মগ্ন হলেন। এই সময় বিষ্ণুর কর্ণমূল থেকে মধু ও কৈটভ নামে দুই দৈত্য নির্গত হয়ে বিষ্ণুর নাভিপদ্মে স্থিত ব্রক্ষ্মাকে বধ করতে উদ্যত হল। ভিত হয়ে ব্রক্ষা বিষ্ণুকে জাগরিত করবার জন্য তাঁর নয়নাশ্রিতা যোগনিদ্রাকে স্তব করতে লাগলেন। সৃষ্টি হয়ে দেবী শ্রীবিষ্ণুকে জাগরিত করলে তিনি পাঁচ হাজার বছর ধরে মধু ও কৈটভের সাথে মহাযুদ্ধে রত হলেন। পিতৃপক্ষ আর দেবীপক্ষের সন্ধিক্ষণ হচ্ছে মহালয়া।

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ প্রতিপদ শুরু হয়ে পরবর্তী অমাবস্যা পর্যন্ত সময়কে পিতৃ পক্ষ বলে। পুরাণ মতে ব্রক্ষার নির্দেশে পিতৃপুরুষরা এই ১৫ দিন মনুষ্যলোকরে কাছাকাছি চলে আসনে। তাই এই সময় তাঁদরে উদ্দেশ্যে কিছু অর্পণ করা হলে তা সহজেই তাদের কাছে পৌছায়। তাই গোটা পক্ষকাল ধরে পিতৃপুরুষদেব স্মরণ ও মননের মাধ্যমে র্তপণ করা হয়। যার চুড়ান্ত প্রকাশ বা মহালগ্ন হল এই মহালয়া। অনেকেই এই দিনটিকে দেবীপক্ষের সূচনা বলে থাকেন। এটি একটি জনপ্রিয় কৃতকর্ম। মহালয়া পিতৃপক্ষের শেষ দিন। পরের দিন শুক্লা প্রতিপদে দেবীপক্ষের সূচনা হয়। সেই দিন থেকে কোজাগরী পূর্ণিমা পর্যন্ত ১৫ দিনই হল দেবীপক্ষ।

দেবীপক্ষের সূচনা

যা চন্ডি মধুকৈটভারী, দৈত্য দলনী, যা মহিষমর্দিনী, যা দুর্গে চন্ড মুন্ডোমালিনী, যা রক্ত বিজশ্বরী, শক্তি সুন্দরী সুন্দর দৈত দলনী-যা-। আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেঁজে উঠেছে আলোক মঞ্জিল, ধরনীর বর্হিআকাশে-অন্তরিত মেঘমালা, প্রকৃতির অন্তর আকাশে জাগরিত জোর্তিময়ী জগৎমাতার আগমন বার্তা, আনন্দময়ী মহামায়ার পদ্ধধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে উঠে রুপলোক ও রসলোকে আনে নবভাব মাধুরীর সঞ্জিবন, ত্রাহি আনান নন্দিতা শামলী মাতৃকার চিন্ময়ীকে-মৃন্ময়ীকে আবাহন। আজ শক্তিরুপীনি বিশ্বজননীর শারদও শ্রীমণ্ডিত প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে ধ্যানগ্রহিতা। মহামায়া-সনাতনী শক্তিরুপা গুণাময়ী-হে ভগবতী মহামায়া তুমিই ত্রিগুনাতিকা, তুমিই রজগুণে ব্রক্ষার গৃহিনী বাগদেবী,শপ্তগুণে বিষ্ণুর পত্নি লক্ষি, তমগুনে শিবের বনিতা পাবর্তী,আবার ত্রিগুনাতিত তুমিই অর্নিবচ্চনিয়া, আবার দেব ঋষি কন্যা কাত্যায়নের কন্যা কাত্যায়নী, তিনিই কন্যাকুমারী আখ্যাতা দূর্গে, তিনিই দাক্ষ্যয়নি সতি, তিনিই আদিশক্তি, দেবী দুর্গা নিজদেহ সম্ভুত তেজপ্রবাহে শত্রুদহনকালে অগ্নিবর্ণা, অগ্নি লোচনা, এই উষা লগ্নে- হে মহাদেবী তোমার উদ্বোধনে প্রাণের ভক্তিরশে আলোকিত হোক দিকে দিকে, হে অমিতজ্যোতি, হে মা দুর্গা, তোমার আবির্ভাবে ধরনী হোক প্রাণময়ী, জাগো জাগো মা।

জাগো দশপ্রহরণ ধারিণী

জাগো দুর্গা, জাগো দশপ্রহরণ ধারিণী, অভয়াশক্তি বল প্রদায়নী তুমি জাগো-দেবী প্রসীদ পরিপালয়ে নো হরি ভীতে: নিত্যং যথাসুরবধদিধনৈব সদ্য: পাপানি সর্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু উৎপাত পাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গানা। পূত পবিত্র এই আহবানের মধ্যে দিয়ে দিবাগত রাতের শেষে ভোরে (১২ অক্টোবর সোমবার) সারাবিশ্বে পালিত হবে পূণ্য তিথি মহালয়া। বাণী কুমারের রচনা ও প্রবর্তনায় মাতৃসাধক বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের অমর কণ্ঠের গ্রন্থনা ও শ্লোক পাঠে আবাহন হবে জগৎ জননী দেবী দুর্গার। দুর্গায়ে দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ, খ্যাত্যৈ তথৈব্য কৃষ্ণায়ৈ ধুম্রায়ৈ সতত: নম:- মাতৃবন্ধনার এ আহবানে পবিত্র পূণ্যতিথি মহালয়া। শারদীয় দুর্গাপুজার সপ্তাহকাল পূর্বে মায়ের আরাধনা বন্ধনায় মহালয়া পালিত হবে।

চন্ডী পাঠ

শাস্ত্রমতে মহালয়া হচ্ছে একটি অমাবস্যা তিথি, এ তিথিতে সাধারনত পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ তর্পণ করা হয়। এ দিন তর্পণ করলে পিতৃপুরুষরা নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে আমাদের আশীর্বাদ প্রদান করেন। এছাড়া মহালয়ার দিনে দেবী দুর্গার বোধন করা হয়, বোধন অর্থ জাগরণ। তাই মহালয়ার পর দেবীপক্ষের/শুক্লপক্ষের প্রতিপদে ঘট বসিয়ে শারদীয় দুর্গাপুজার সূচনা করা হয়। শ্রাবণ থেকে পৌষ ছয় মাস দক্ষিনায়ণ, দক্ষিণায়ণ দেবতাদের ঘুমের কাল। তাই বোধন করে দেবতাদের জাগ্রত করা হয়। মহালয়ার পর প্রতিপদে যে বোধন হয় সে সময় সংকল্প করে দুর্গাপুজার আয়োজন চলে। একে বলে কল্পরম্ভা, যদিও ষষ্ঠি থেকে পূজার প্রধান কার্যক্রম শুরু হয় তাই বলা হয় ষষ্ঠাদিকল্পরম্ভা। এবং সপ্তমী থেকে বিগ্রহতে। প্রতিপদ থেকে শুধু ঘটে পুজো ও চন্ডী পাঠ চলে।

দুর্গা, নবপত্রিকা, কলাবউ

দুর্গাপূজা শুরু হয়েছে। আজ মহাসপ্তমী। গতকাল বেলগাছের নিচে দেবীদুর্গার বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস হয়েছে। বোধন মানে দেবীকে ঘুম থেকে জাগানো। শাস্ত্রমতে, আষাঢ় থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত দেবদেবীদের ঘুমানোর সময়। ঘুম ভাঙিয়ে দেবীকে মাঝপথে তোলা হয়, তাই

অকালবোধন। সেই জাগরণ বা বোধনের পর ঢাক-ঢোল কাঁসরঘণ্টা বাজিয়ে সকালেই দেবীপূজার শুরু। এই সূচনাকে বলে, নবপত্রিকা প্রবেশ। শ্বেত অপরাজিতার লতা ও হলুদ রঙের সুতোয় বাঁধা নয়টা গাছ-কলা, ডালিম, ওলকচু, জয়ন্তী, অশোক, হলুদ, বেল, ধান, মানকচু। এই নয়টা গাছ, লতাপাতা বাংলার জলেজঙ্গলে অক্লেশে হয়ে থাকে। দুর্গা মূর্তির ডান পাশে নবপত্রিকার এই কলাগাছ স্বাভাবিক ভাবে নুইয়ে পড়ে। ফলে বাঙালি একে গণেশের বউ বা কলাবউ বলে। আদতে গণেশের সঙ্গে কলাবউয়ের কোনও সম্পর্ক নেই। এই অযত্নলালিত উদ্ভিদগুলি সকলে দুর্গারই রূপ। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় দেবীর অধিবাস, বোধনের পাশাপাশি নবপত্রিকারূপী দুর্গাকেও আবাহন করতে হয়। প্রতিটি গাছেই দেবীর অধিষ্ঠান-কলায় ব্রহ্মাণী, কচুতে কালী, হলুদগাছে দুর্গা, জয়ন্তীতে কার্তিকী, বেলে শিব, ডালিমে রক্তদন্তিকা, অশোকে শোকরহিতা, মানকচুতে চামুণ্ডা ও ধানে লক্ষ্মী।

গণেশের লাজুক বধূ নয়, দুর্গার সৃষ্টি স্থিতিবিনাশী শক্তিরূপেই নবপত্রিকা পূজিত হন। 'পুরোহিত দর্পণ'-এ আছে, "সপ্তমীর সকালে বাদ্য ধ্বনি সহকারে বিল্বশাখা ও নবপত্রিকা লইয়া পূজালয়ে প্রবেশ করিবে।" মানে, বেলগাছের ডালটিই সব নয়। তার সঙ্গে এ দিন দুর্গারূপিণী নবপত্রিকারও পূজা।

শরৎকালে দুর্গাপূজার প্রচলন রামচন্দ্রের হাত ধরে, এমনটাই আমরা জানি। যদিও মূল বাল্মীকি রামায়ণে রাবণবধের আগে দুর্গাপূজার উল্লেখ নেই। চণ্ডীতে উল্লেখ আছে, শরৎকালের এক মহাপূজার কথা। সেখানে দেবী মাহাত্ম্য পাঠের উল্লেখও আছে। কিন্তু পূজাটি সঠিক যে কী, তা স্পষ্ট নয়। বিশেজ্ঞদের মতে, এই পূজাই হল নবপত্রিকা পূজা। আসলে সেই পুরাকালে যখন সাকার মূর্তির উপাসনা ছিল না, তখন মানুষের ধর্মাচরণের সঙ্গী ছিল এই উৎসব। অরণ্যজীবন তখন মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। আর তাই মানুষের উৎসব এই প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ বা শস্যকে বাদ দিয়ে ছিল না।

ইতিহাসের দিকে তাকালে আরও অনেক জাতির ক্ষেত্রেই শীতের প্রারম্ভে উদ্ভিদ নিয়ে এরকম উৎসবে মেতে ওঠার প্রথা দেখতে পাওয়া যায়। এখানেও তা-ই ছিল। কালে কালে সেই শস্যপূজা বা উদ্ভিদপূজার রীতির সঙ্গে দেবীদুর্গার মাহাত্ম্য যুক্ত হয়েছে। এক একটি উদ্ভিদের সঙ্গে দেবীর এক এক রূপের সংযোগ রচিত হয়েছে। আর সেই প্রাচীন নবপত্রিকার আরাধনা অঙ্গীভূত হয়েছে দুর্গার অকালবোধনের সঙ্গে। এই রীতি তাই আজও সাক্ষ্য বহন করে আমাদের অতীত উৎসবের।

অযত্নলালিত কলা, কচু, ঘেঁচু বাঙালি সম্প্রদায় নির্বিশেষে পুষ্টির জন্য খায়। ডালিম শক্তিবর্ধক ও রক্তবর্ধক। জয়ন্তী এবং অশোক আয়ুর্বেদের মহৌষধ। মণ্ডপে মণ্ডপে তাই দুর্গার আলো-ঝলমল মহিষাসুরমর্দিনী রূপটি দেখলে বা কলাবউ নিয়ে ঠাট্টা করলে চলবে না, সপ্তমীর দিনে দেশের শক্তিরূপিণী উদ্ভিজ্জ প্রকৃতির দিকও খেয়াল রাখতে হবে।

সূত্র : ইন্টারনেট

নজরুলের কালীভক্তি ও শ্যামা সঙ্গীত

রিফাত বিন সালাম রূপম

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার সময়ের সবচেয়ে আলোচিত কবি ছিলেন। সমাজের নিপীড়িত মানুষকে প্রতিবাদী করে তোলার মত ক্ষমতা একমাত্র নজরুলেরই ছিল। সে সময় ভারতীয় অঞ্চলে নজরুল ব্যতীত অন্য কোনো সাহিত্যিকের সাহিত্য মানুষকে এত আন্দোলিত করতে পারেনি। রবীন্দ্র সাহিত্যভাষা নজরুলের মতো এত প্রতিবাদী ছিল না। উত্তাল ভারতবর্ষে নজরুলের 'বিদ্রোহী' বা 'আনন্দময়ীর আগমনে' অথবা 'ধূমকেতু' কবিতা ব্রিটিশ শাসনের শক্ত ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। যা অন্য কোনো কবি-লেখকের দ্বারা সম্ভব হয়নি।

নজরুল দ্রুত জনপ্রিয় হয়েছিলেন হিন্দু-মুসলিমে বিভাজিত সে সময়কার ভারতীয় সমাজে। নজরুল বিষয়ে সকল মহলে শুরু হয় বিস্তারিত আলোচনা। তবে আলোচনা শুধু আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সমালোচনাও ছিল ব্যাপক। মুসলিম হওয়ার কারণে হিন্দুদের একটা শ্রেণি নজরুলকে বিজাতি মনে করত। ঠিক একইভাবে একশ্রেণির মুসলমান নজরুলকে বিজাতি ঘোষণা করেছিল। কারণ ছিল হিন্দু ধর্মের প্রতি নজরুলের অতি আগ্রহ। নজরুলের 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতা পড়লে সহজেই বোঝা যায়, ওই সমাজের মুসলিমদের একটা শ্রেণি নজরুলকে কাফির আখ্যা দিতে দ্বিধা করেনি। নজরুল 'আমার কৈফিয়ৎ'এ লিখেছিলেন-

'মৌ-লোভী যত মৌলবী আর
'মোল্লারা ক'ন হাত নেড়ে,
দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও
পাজিটার জাত মেরে!'

বাংলা সাহিত্যে আর কোনো সাহিত্যিককে নিয়ে এত সমালোচনা হয়নি কখনো। বিশেষ করে কট্টরপন্থি মুসলমানদের মধ্যে নজরুল সম্পর্কে সবচেয়ে বড় অভিযোগের কারণ ছিল নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত। একটা সময়ে পূর্ববঙ্গের বেতারেও নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত সম্প্রচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল।

তৎকালীন ভারতবর্ষের অবস্থা উত্তাল, একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর অন্যদিকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রস্তুতি। বিশ্বময় পুঁজিবাদী দেশগুলোর আগ্রাসন শুরু হয়েছিল। এমন উত্তাল সময়ে প্রতিবাদই ছিল নজরুলের একমাত্র ভাষা। সে সময় 'শাক্তদর্শন' ব্যপকভাবে প্রভাবিত করেছিল নজরুলকে। নজরুল কালী সাধনাও শুরু করেছিলেন।

শাক্তধর্ম মানে শক্তিবাদ। হিন্দুধর্মের প্রধান তিনটি বিভাগের অন্যতম এটি। হিন্দুধর্মের একটি শাখাসম্প্রদায় ছিল এই শাক্ত অনুসারীরা। হিন্দু দিব্য মাতৃকা শক্তি বা দেবী পরম ও সর্বোচ্চ ঈশ্বর- এই মতবাদের ওপর ভিত্তি করেই শাক্তধর্মের উদ্ভব। আর এই শাক্তদর্শন থেকেই নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত রচনা শুরু।

হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী মতে, দুর্গাদেবীর একটি বিশেষ রূপ হল 'কালী'। এই কালীদেবীরই অন্য নাম আবার শ্যামা। শ্যামাবন্দনা বা শ্যামাদেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত গানগুলোকে সাধারণভাবে শ্যামাসঙ্গীত বলা হয়। শাক্তসঙ্গীত নামটিরও ব্যবহার হয় এক্ষেত্রে। 'শ্যামা মা'র পরিচয় দিতে গিয়ে কবি লিখেছিলেন-

"মার হাতে কালি মুখে কালি,
মা আমার কালিমাখা, মুখ দেখে মা
পাড়ার লোকে হাসে খালি।
মোর লেখাপড়া হ'ল না মা, আমি 'ম'
দেখিতেই দেখি শ্যামা,
আমি 'ক' দেখতেই কালী ব'লে নাচি
দিয়ে করতালি।"

নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত জনপ্রিয় হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল, আবেগের গভীরতা। কেউ কেউ মনে করেন, নজরুল হৃদয়ের গভীর থেকে শ্যামার প্রতি ভক্তি নিবেদন করেছিলেন। আর সে ভক্তি সাকার হয়েছিল তার গানের ভাষাতে। তিনি লিখেছিলেন-

"ভক্তি, আমার ধুপের মত,
উর্ধ্বে উঠে অবিরত।
শিবলোকের দেব দেউলে,
মা'র শ্রীচরণ পরশিতে।"

খ্রিস্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় বৈষ্ণবধর্মের পাশাপাশি শাক্তধর্মের উদ ৬ব ঘটে এবং তাকে কেন্দ্র করেই শাক্তগীতি চর্চার একটি ক্ষীণ ধারা প্রচলিত হয়। এই সময় বঙ্গদেশে তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বৈষ্ণবধর্মের চেয়ে শাক্তদর্শন ও শক্তিপূজা ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। শ্যামা সঙ্গীতের ধারাটি বিকাশ লাভ করে খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। আঠারো শতকের মধ্যভাগে সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন এতে প্রাণ সঞ্চার করে বাংলা গানের জগতে শাক্ত পদাবলি বা শ্যামাসঙ্গীত নামে একটি বিশেষ সঙ্গীতধারা প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শ্যামা সঙ্গীতকার ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম।

নজরুল প্রায় ৪০০০ গান রচনা করেছেন এবং অধিকাংশের সুর নিজেই করেছেন, যেগুলো এখন নজরুল সঙ্গীত বা 'নজরুল গীতি' নামে পরিচিত। যার বড় একটি অংশই শ্যামাসঙ্গীত। সঙ্গীত বিষয়ক নজরুলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হচ্ছে

'রাঙা-জবা'। ১৯৬৬ সালে ১০০টি শ্যামাসঙ্গীতে সমৃদ্ধ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। শক্তি পূজায় তাঁর ভক্ত হৃদয়ের অকৃত্রিম আকুলতা ও আর্তি রাঙা-জবা'র গানের মধ্যে রূপায়িত।

নারীশক্তির প্রতি নজরুলের ভক্ত হৃদয়ের অকৃত্রিম আকুলতা চিরকালই ছিল। তাই শুধু শ্যামাসঙ্গীতের প্রভাব সঙ্গীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তার কবিতাতেও প্রকাশ পেয়েছিল। ধূমকেতুতে প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামে যে কবিতাটির জন্য কবির এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। সেই কবিতায়ও ছিল শাক্তসাধনার প্রকাশ-

"আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।
দেব-শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবকদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা, আসবি কখন সর্বনাশী?"

সাহিত্য চর্চার জন্য সামান্য কিছু সময় পেয়েছিলেন নজরুল। কিন্তু জীবনের এই অল্প সময়েই তিনি রেখে যান বাংলার জন্য এক সুর ভাণ্ডার। ধর্মীয় দৃষ্টিতে শ্যামাসঙ্গীত নানাভাবে বিতর্কিত হয়-এটা সত্য। কিন্তু তার শ্যামাসঙ্গীতের রচনা কৌশল আর ভক্তির গভীরতা বোঝা যায় নির্দ্বিধায়। সেসব ভক্তিগীতির মধ্যেও ছিল ধূমকেতুর ন্যায় অন্তরজ্বালা আর বিষে ভরা চির বিদ্রোহের বাণী। আজও ভারতবর্ষে শ্যামাসঙ্গীত বিষয়ে আলোচনা উঠলে সবার আগে নজরুলের সৃষ্টি দিয়ে শুরু করতে হয়। শ্যামাসঙ্গীতের নান্দনিক প্রভাব পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মরমী ও ভক্তিগীতি, এমনকি দেশাত্মবোধক গানের মধ্যে আজও প্রবহমান।

HOYA
SURGICAL OPTICS

THE FASTEST GROWING IOL COMPANY IN THE WORLD

Sontosh Chandra Nath

Managing Director & CEO
Alpha Vision Limited

Executive Member
- Switzerland Bangladesh Chamber of Commerce & Industry

Member
- Transparency International Bangladesh -TIB
- Apex Bangladesh Foundation
- The Comilla Club
- Iskcon

- **Secretary General**
  Ophthalmic Products Importers & Owners Association of Bangladesh

হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিতে কাজী নজরুল ইসলাম

মেহেদি হাসান মোল্লা

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ। আজ থেকে ১১৯ বছর আগে এই দিনে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম অবিভক্ত বাংলার পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, সাংবাদিক, সম্পাদক, রাজনীতিবিদ এবং সৈনিক হিসেবে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেছেন যা বিশ্বের ইতিহাসে চির স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি কাব্যে যেমন বিদ্রোহী ছিলেন বাস্তবেও ছিলেন তেমনি বিদ্রোহী। তাঁর কবিতার মূল বিষয়বস্তু ছিল দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার এবং সামাজিক অনাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লেখার মাধ্যমে প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনেক লাঞ্ছনা, অত্যাচার এমনকি কারাবরণও করতে হয়েছে তাঁকে।

কাজী নজরুল ইসলাম তরুন তুর্কীদের প্রেরণা, সভ্য সমাজের মূর্তপ্রতিক। অসাম্প্রদায়িক সমাজ প্রতিষ্ঠায় আজন্ম তিনি ছিলেন সোচ্চার। তাঁর আদর্শ ধারণ করতে পারলে আমাদের অনেক সমস্যাই সহজে সমাধান হয়ে যেত তাতে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমানে নজরুলের মত সত্যের জন্য নিবেদিত প্রাণ, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর খুবই প্রয়োজন।

তিনি ছিলেন বিশ্ব সাহিত্যে এক বিস্ময়কর প্রতিভা। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তাঁর যে চেতনা ছিল সেটা প্রকৃত ইসলামের কাছাকাছি বলা যেতে পারে। তিনি সমাজের শোষক শ্রেণি এবং হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মের ধর্ম ব্যবসায়ীদের লেখার মাধ্যমে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'তব মসজিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবী, মোল্লা পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি!' বর্তমান সময়ে আমাদের সমাজে কবির এই কথা কঠিন বাস্তব। তিনি ধর্মের গোঁড়ামিকে সর্বদা সামনে থেকে প্রতিবাদ করেছেন কলম দিয়ে। বলেছেন "মন্দির আর মসজিদ ওই শয়তানদের মন্ত্রনাগার।" তিনি নিজেই আবার উত্তর দিয়েছেন "মিথ্যা শুনিনি ভাই/এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির-কাবা নাই"। সমস্ত ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে বেরিয়ে তিনি সর্বদা চেয়েছেন জাতপাতের উর্ধ্বে মানবধর্মের প্রতিষ্ঠানের কথা।

নজরুল আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেছেন, "সুন্দরের ধ্যান, আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কূলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই কবি।" তিনি সাম্যবাদী কবিতায় আরও লিখেছেন,

> "গাহি সাম্যের গান
> মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহিয়ান।
> নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
> সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।'
> যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব ব্যবধান,
> যেখানে মিশেছে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম খ্রীস্টান।"

সুনির্দিষ্ট কোন ধর্ম, দর্শন কিংবা জীবনচর্যায় তিনি দীর্ঘকাল থাকতে পারেননি; তবুও সকল ধর্মের সার্বজনীন মূল্যের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় আস্থা। আর এই আস্থা তাঁকে হিন্দু কিংবা মুসলমানের কবি না করে, করেছে বাংলা ও বাঙালির কবি। কবি নজরুলের সাহিত্য সেই রসাদর্শের সাহিত্য। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে আহরিত জ্ঞান ও বাংলা ভাষার পাশাপাশি আরবি-ফারসি-হিন্দি, উর্দু-সংস্কৃতি শব্দাবলি নজরুলের সাহিত্যকে এক অনন্য বৈশিষ্ঠ্যে চির ভাস্কর করেছে। জীবনের বেলায়-অবেলায় কবি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে অনুভব করেছিলেন হৃদয় দিয়ে। নজরুলের কারাজীবনে অন্তরঙ্গ সুহৃদ নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী নজরুলের বাঙালিত্ব সম্বন্ধে যে বক্তব্য করেছেন তার অংশবিশেষ- "হিন্দু ও মুসলমানের প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন ছিল বাঙালি ও বাঙালিত্ব নিয়ে। বাংলার সবই ছিল কাজীর আপন, প্রিয় পুরাণ, রামায়ণ, বা মহাভারত বাঙালির কাব্য। কাজী বাঙালি। তাই কাজীর কাছে প্রাচীন কাব্য ও সাহিত্য তার রূপ ও বৈভব নিয়ে ধরা দিয়েছেন। বিদ্রোহ আর প্রেমের সমন্বয়ে কাজী বাঙালি কবি, কাজী বাঙালি মরমী প্রেমিক, কাজী বিদ্রোহী বাঙ্গালির মুখর বন্দনা।" নজরুলের সাহিত্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, নজরুল হিন্দু দেব দেবীকে নিয়ে যেমন কবিতা, গান ইত্যাদি রচনা করেছেন তেমনি মুসলিম আদর্শ ও ঐতিহ্যকে অপূর্ব সুন্দরভাবে লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরেছেন। তাইতো মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সংগ্রামে এবং পরমত সহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠা ও ধর্মীয় সম্প্রীতি সাধনায় তাঁর কবিতা ও গান বাঙালিকে যোগায় অনিঃশেষ প্রেরণা।

নজরুল ছিলেন মূলত সকল ধরনের

প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে এক অমর প্রতিদ্বন্দ্বী। ব্রিটিশ শাসনের শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করার প্রবল বাসনা তিনি সব সময় অনুভব করেছেন। 'কালের যাত্রার ধ্বনি' শুনে তিনি তাঁর দু-যুগের কাব্য পরিক্রমায় মাঝে মাঝেই হয়তো পথ দর্শন এমনকি ধর্মাদর্শ বদলিয়েছেন। কিন্তু ভেদবুদ্ধিহীন, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে কখনও নিজেকে বদলাননি। ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক জীবনে তিনি ছিলেন, সম্পূর্ণ সম্প্রদায়-নিরূপে মানুষ। বিবাহ করেছেন মুসলমান নার্গিস আক্তার খানম ও হিন্দু প্রমীলা দেবীকে। প্রমীলাকে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করার কথা কবি কখনো চিন্তা করেন নি। এমনকি স্ত্রীর নামটিও পরিবর্তন করে মুসলিম নাম রাখেন নি। নজরুলের চারটি সন্তান ছিল। তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ঐতিহ্য ও পুরাণের আলোকে নাম রেখেছিলেন। তাঁর প্রথম সন্তান কৃষ্ণ মোহাম্মদ। চার বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। এরপর তিন সন্তান হচ্ছে, অরিন্দম খালিদ, কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধ। এর মাধ্যমে আমরা সহজে বুঝতে পারি যে, এই হিন্দু মুসলিমের মিলনই তিনি আজীবন চেয়েছিলেন।

কবির সখ্য ও বন্ধুত্ব ছিল হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল ধর্মের মানুষের সাথে। শৈলজানন্দ মজুমদার, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, মুজাফ্ফর আহমদ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী মোতাহার হোসেন, দিলীপ কুমার রায় প্রমুখ ছিলেন তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সূত্রপাত হলে যে অসহনীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয় তখন নজরুল রচনা করেন উদ্দীপ্ত সংগীত। ১৯২৬-এর ২২ মে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির বার্ষিক সম্মেলনে কবি সবাইকে চমকে দিয়ে 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' উদ্বোধনী সংগীত গেয়ে শোনান। তিনি যখন উচ্চারণ করেন, "হিন্দু না মুসলিম ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন/কাণ্ডারী বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মা'র-" তখন হিন্দু-মুসলিম প্রত্যেকে একতাবদ্ধ হয়ে ওঠেন। এর পর তিনি 'হিন্দু মুসলিম যুদ্ধ', 'পথের দিশা' প্রভৃতি কবিতা এবং 'মন্দির-মসজিদ' প্রবন্ধ লিখে দেশবাসীকে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে নজরুলের মত বীর যোদ্ধার খুবই প্রয়োজন এই সমাজে। সমাজকে কলুষমুক্ত করতে দরকার তাঁর মত সাহসী মানসিকতা। দিনের পর দিন বাংলা তথা ভারতের আকাশে বাতাসে ঘনীভুত হচ্ছে সাম্প্রদায়ীক বিষবাষ্প। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে কতিপয় মানব দরদী স্বত্তার। ধর্মীয় হানাহানি, সাম্প্রদায়ীক ঘটনা গুলিকে নিয়ে এক শ্রেণির কুলাঙ্গার মানুষের মধ্যে মেরুকরনের আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আজ থেকে ১০০ বছর আগে বলে যাওয়া নজরুলের বাণী আজ খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে- "বিশ্ব যখন এগিয়ে চলছে, আমরা তখনও বসে/বিবি তালাকের ফতোয়া খুজেছি, ফিকায় ও হাদিস চষে।"

নজরুলের কবিতায় একদিকে যেমন ঠাঁই পেয়েছে মুসলিম আদর্শ অন্যদিকে হিন্দু আদর্শ। সর্বোপরি এ সব কিছুর মূল সুতো হচ্ছে তাঁর সাম্যবাদী মনোভাব, তাঁর মানবতাবোধ। তিনি তাঁর লেখনীতে যে সাম্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন তা স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবতা এবং সুবিচারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জাতি-বৈষম্য, শ্রেণি-বৈষম্যের প্রতি তাঁর কণ্ঠ সর্বদাই সোচ্চার ছিল। আর এ সকল কিছুর মূল ছিল মানবমুক্তি ও মানবকল্যাণ। 'কুলি-মজুর' কবিতায় তাঁর মানবতার পরিচয় ফুটে উঠেছে এভাবে- দেখিনু সেদিন রেলে/কুলি বলে এক বাবুসাব তারে টেনে দিল নিচে ফেলে/চোখ ফেটে এল জল/এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল।' তিনি মানুষকে সেরা জীব হিসেবে স্থান দিয়েছেন। তিনি জাতির স্বাধীনতার সাথে একাত্ম করে নির্যাতিত ও ক্ষমতা বঞ্চিত মানুষের মুক্তির কথা ভেবেছেন।

মানবতার আবেগেই তিনি সাম্যের গান গেয়েছেন। তিনি চেয়েছেন সাম্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়তে। তাই তাঁর কাব্য, গানে-গল্পে মানবতাবোধ থেকেই এসেছে বিদ্রোহ, অসম্প্রদায়িক ও সাম্যবাদের চেতনা। তিনি মনে করতেন যা কিছু মানুষের জন্য সুন্দর ও কল্যাণকর তাই ধর্ম। সমাজে যারা নির্যাতিত, অপমানিত, অবহেলিত তারাই কবিচিত্তে আকৃষ্ট করেছে। এ সকল মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকে লাঘব করতে তাঁর লেখনী কাজ করেছে। তিনি লিখেছেন,

'মহা বিদ্রোহী রণ-কান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল
আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম
রণভূমে রণিবে না।'

তাঁর জীবনসাধনাকে কোনভাবেই শিল্পসাধনা থেকে আলাদা করা যায় না। তিনি সারাজীবন সাম্য-সম্প্রীতি ও মিলনের গান শুনিয়েছেন। কবিতা ও গানে তিনি ব্যবহার করেছেন হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের ঐতিহ্য থেকে শব্দ ও ভাষা। কিন্তু মননে-মগজে ছিলেন সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ঐতিহ্য স্পর্শ করে তিনি চলে গেছেন অসাম্প্রদায়িকতা ও উদার মানবিকতার দিকে।

তার সৃষ্টিশীল সময় ছিল মাত্র ২৫ বছর। এই সময়ে তিনি সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। সর্বকিছুই ছিল নজরুলের মধ্যে।

নজরুলের দৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনো ধরনের পার্থক্য মানুষ হিসেবে পরিলক্ষিত হয়নি। দেখাননি জাতি বিদ্বেষও। তিনি লিখেছেন- 'আমাদের মধ্যে ধর্ম বিদ্বেষ নাই, জাতি বিদ্বেষ নাই, বর্ণ বিদ্বেষ নাই, আভিজাত্যের অভিমান নাই। পরস্পরকে ভাই বলিয়া একই অবিচ্ছিন্ন মহাত্মার অংশ বলিয়া অন্তরের দিক হইতে চিনিয়াছি।' কবির ভাষায়,

'সাম্যবাদী-স্থান-
নাই কো এখানে কালা ও ধলার
আলাদা গোরস্থান।
নাই কো এখানে কালা ও ধলার
আলাদা গীর্জা-ঘর,
নাই কো পাইক-বরকন্দাজ নাই
পুলিশের ডর।
এই সে স্বর্গ, এই সে বেহেশত,
এখানে বিভেদ নাই,
যত হাতাহাতি হাতে হাত রেখে
মিলিয়াছে ভাই ভাই।' আবার তিনি হিন্দু মুসলিমের মিলনের জন্য রচনা করেছেন- "মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান/হিন্দু তার নয়ন মনি মুসলিম তাহার প্রান।"

আজকে বিশ্বব্যাপী নারী অধিকার নিয়ে প্রতিটি দেশেই আন্দোলন হচ্ছে। যা নজরুল অনেক আগেই বিশ্ববাসীকে দেখিয়েছে। চিন্তা করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। কবির ভাষায়,

'বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'

তিনি কখনও নারী শক্তিকে অবহেলা করেননি বরং সর্বদা প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- "কোন কালে একা হয়নি কো জয়ী পুরুষের তরবারি/ প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়ালক্ষী নারী।"

পচনধরা প্রথাগত সমাজকে ভেঙেচুরে নতুন এক সমাজ গঠন করাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। তাই তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন অন্যায়, অত্যাচার, অসত্য, শোষণ-নির্যাতন আর দুঃখ-দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ও পরাধীনতার গ্লানি থেকে জাতিকে মুক্ত তথা স্বাধীন করার জন্য তিনি কলম ধরেছিলেন। কবিতা লেখার অপরাধে তাকে জেলে যেতে হয়েছে। তবুও থামানো যায় নি তাঁর লেখা। দুঃখ-দারিদ্র্য এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কেটেছে তাঁর পুরো জীবন। কখনো অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেন নি। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী, মানবতাবাদী ও সাম্যের কবি।

ছবি : তন্ময় সেন

শক্তি পূজিতা প্রণম্য

সান্তনু দাস

জগতের প্রাচীনতম ধর্মবিশ্বাস হিন্দুধর্ম। হিন্দুধর্ম মূলতঃ সনাতন ধর্মশাস্ত্রের ভাষায় একে অন্য নামেও ডাকে অনেকে যেমন বৈদিক ধর্ম, আর্যধর্ম।

এর গর্ভে জন্ম নিয়েছে আরও ৩টি ধর্ম-বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, শিখধর্ম।

পৃথিবীর সব ধর্মমতই ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা দিয়েছে। একমাত্র বৌদ্ধধর্ম স্পষ্ট করে কিছু বলেনি এ সম্পর্কে।

সনাতন ধর্ম ঈশ্বর সম্পর্কে যেভাবে বলেছে আর কেউই এমনটা গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলেনি।

বেদ বলেছেন-ঈশ্বর এক ও অভিন্ন, ইচ্ছে করলে তিনি বহু হতে পারেন।

তিনি সাকার সগুণ আবার নিরাকার নিরগুণ।

গীতা বলেছেন- মানুষ আমাকে যেভাবে- ভজনা করে আমি তাকে সেভাবেই অনুগ্রহ করে থাকি।

হিন্দু সাধনায় ভগবানকে নানাভাবে সাধনা করার যে বিধান তাতে ভগবানের সাথে সাধকের পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ আছে। যেমন- মা দুর্গা, বাবা বিশ্বনাথ, বন্ধু কৃষ্ণ, বড়ভাই বলরাম ইত্যাদি।

হিন্দুধর্মে দেবতার তুলনায় দেবীর সংখ্যা বেশি। দেবতাদের তিনটি ভাগ আছে-বৈদিক, পৌরাণিক, লৌকিক। লৌকিক দেবতার সংখ্যা বেশী। আবার এক দেবতা ও দেবী বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পূজিত হয়ে থাকেন। শুধু যে আমরা দেবতার পূজা করে থাকি শুধু তাই নয়, প্রাচীন গ্রীস, রোম, মিশরে বহু দেবতার পূজা হতো।

আজকে যে বিষয়ে আলোচনা করব, শক্তির দেবী-দুর্গা-প্রাচীন গ্রীসে বলা হত মিনার্গ- একটু পার্থক্য আছে আমরা বলি শক্তির দেবতা। প্রাচীন গ্রীসে বলা হত শক্তি এবং বিদ্যার দেবী, শক্তিকে আমরা পূজা করছি, হিন্দু ধর্মে একে শাস্ত্রের ভাষায় বলে তন্ত্র সাধনা। যারা সাধনা করে তাদেরকে বলে তান্ত্রিক।

এ সাধনায় যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁদের নাম আমাদের অনেকেরই জানা যেমন- রামপ্রসাদ, বামাক্ষেপা, কমলাকান্ত, রামকৃষ্ণ। ইংরেজ সাধক আছেন, যার নাম জন উডরফ্-প্রথম জীবনে এক তড়িৎ বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর সাধনার উপলব্ধি দিয়ে ইংরেজিতে একখানা বই লিখে রেখে গেছেন, গ্রন্থখানার নাম 'তন্ত্র ইজম্'। আধুনিক বস্তুবিজ্ঞান শক্তিকে প্রয়োজনে ব্যবহার করছে বেতনভোগী ভৃত্যের মত। হিন্দু সাধনা করছে-শক্তি পূজিতা প্রণম্য। মহাবিশ্ব চলছে একটা শক্তিতে-

চণ্ডী বলছেন- 'একৈ বাহং জগত্যত্র
দ্বিতীয়া কা মমাপরা'
গীতা বলেছেন- পশ্য মে
যোগমৈশ্বরম্।

উপমহাদেশের এক নারী যোগী তিনিই এ সম্পর্কে অভিহিত করেন বিশ্ববাসীকে, তিনি হলেন- অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাগদেবী। যার বর্ণনা আছে ঋগবেদের দেবীসূক্তে বা বাক্সূক্তে।

তন্ত্র সাধকেরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সম্পন্নও বটে তাদের সাধনার বলে -বহু গবেষণালব্ধ পাওয়া গেছে। রসায়ন শাস্ত্রবিদ- আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের History of Hindu Chemistry.

দর্শন আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এর Positive Science of Hindu.

তন্ত্র শব্দের অর্থ হল- যে কোন বিষয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও যুক্তিপূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান- Systematic scientific study.

পাশ্চাত্যের গ্রে সাহেবের Anatomy. আর তন্ত্র সাধকের ঈড়া, পিংগলা, সুষুম্না, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, আজ্ঞাচক্র একই রকম।

ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, আকাশের জ্যোতির্মণ্ডল, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব, বীজগণিত, জ্যামিতি, মূলতঃ তন্ত্রশাস্ত্রেরই দান।

আমাদের দেশে শক্তিপূজা করছি তা দেবী দুর্গা নামে পরিচিতা। এর আরও অনেক নাম আছে। মূর্তিখানা সবারই পরিচিত।

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের মাঠে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন-তুমি দুর্গাস্তব করে যুদ্ধ আরম্ভ কর।

চণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ে রাজা সুরথ জানতে চেয়েছেন- মেধস ঋষির কাছে। আপনি যাকে মহামায়া বলেছেন তিনি কে?

ঋষি উত্তরে বলেছেন-জগন্মূর্তি, এই জগৎই তার মূর্তি, এই বিশ্ব চরাচর মহামায়ার অধীন।

জীব গোস্বামী ভগবৎ সন্দর্ভে- মঃ কৃষ্ণ সৈব দুর্গা সাৎ

যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।

বাংলায় প্রথম দুর্গা পূজা প্রচলন করেন-বর্তমান রাজশাহী জেলার জমিদার কংসনারায়ণ। আজ দুর্গা পূজা সর্বজনীন- এর পারিবারিক সমাজতাত্ত্বিক বিভিন্ন দিক আছে। বিশ্ব শান্তির জন্য U.N.O রাষ্ট্রসংঘ আছে ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্রজীবনের

কল্যাণ করা এর কাজ। মা দুর্গা বলছেন–আমি রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের কাজ প্রজাতন্ত্রের সবার সুখ নিশ্চিন্ত করা। আসুরিক শক্তি বেড়ে গেলে সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন হয়। তাই মা দুর্গা অসুর নিধন করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আবির্ভূত হন। সিংহকে পায়ের নীচে চেপে রেখেছেন– বলেছেন হিংসা যদি অন্তরে জাগে বিনষ্ট হবে সম্পূর্ণ জীবন। সরস্বতী বলছেন– আমার হাঁসের কথা জান, জলে দুধে মিশে থাকলে দুধ নিবে, জল নিবে না। তুমি অবিদ্যা ত্যাগ করে জ্ঞানরূপ দুধ নাও। লক্ষ্মী বলছেন– আমার প্যাঁচার মত অর্থ বিত্তের অহংকারে অন্ধ হইও না। কার্তিক বলছেন– সদা সতর্ক থাক দুষ্ট ব্যক্তি থেকে। গণেশ বলছেন– দেখছ না আমার বাহন ইঁদুরটিকে, আমার শরীর হাতির মত আমাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ইঁদুর। বৃহতের সাথে ক্ষুদ্রের সংযোগ না থাকলে গণতন্ত্র ব্যাহত হয়। রাষ্ট্রশক্তি তাই গণমানুষের সেবার ভেতর দিয়েই গণতন্ত্র ধরে রাখছে।

(‘কান্তিবন্ধু ব্রক্ষচারী’ এর লেখা থেকে সংগৃহিত)

লেখক : সহ–সভাপতি : তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ
সাধারণ সম্পাদক: দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লি:

তুমি আসবে বলে

কামরান চৌধুরী

রামচন্দ্রের ডাকটি শুনে আশ্বিনে মায়ের অকাল বোধন
স্বর্গদেব গণের একত্র শক্তি নিয়ে মর্তে করো অসুর নিধন।
বছর বছর মর্তে এসে, সব হৃদয়ে জাগাও শক্তি তুমি
আবার ফিরে যাও কৈলাসে, ব্রহ্মস্বরূপিণী... তোমার চরণ চুমি।
তুমি আসবে বলেই দেখো– প্রকৃতি সেজেছে আজ কতো
শুভ্র কাশে ভরে গেছে মাঠ, ভোরের শিশিরে স্নাত ঘাস।
নীলাকাশে মেঘের ভেলায় টুকরো টুকরো সুখ বাস
শিউলি বেলিতে সুরভিত আহা আনন্দিত চারপাশ।
শব্দ ঘন্টারা মিলিয়ে যায়, মন মাঝে নিস্তব্ধ কোঠায়
তোমার মুখে চেয়ে চেয়েই্. লুপ্ত সুগভীর মগ্নতায়।
তুমি আসবে বলে সারাটা বছর অপেক্ষা করে থাকা
তুমি ছাড়া জীবন যে বড়, অসহায় লাগে ফাঁকা ফাঁকা।
তুমি আসবে বলে উন্মুখ বৃদ্ধ–শিশু–যুবক–ঘরণী
কেনাবেচায় ব্যস্ত দোকানী, সুর–ছন্দে আনন্দ ধরণী।
দুর্গা আছে আমারই ঘরে, দুর্গা আছে তোমারও ঘরে
দুর্গা আছে পথে–ঘাটে–জলে, আকাশে বাতাসে সেবাশ্রমে
দুর্গা দেখো আছে কর্মস্থলে, বিদ্যাপিঠ–সভা মন্দির–মঠে।
চিনেও চিনিনা, বুঝি নাতো, মা, তব তেজস্বিতা শক্তিমত্তা।
মা তুমি অন্তরযামিনী, দুর্গতিনাশিনী
যে ডাকে তোমায়, তুমি তারই সহায়
না ডাকে যে, তুমি তারও সহায়;
তবে বলতে পারো্ কেন ডাকবো তোমায়?
আমার ঘরের দুর্গা সেতো দিন রাত খাটে
তবু তার ভাগ্যে কভু, সুখ–শান্তি নাই জোটে।
পাশের বাড়ির দুর্গা সেতো দিন রাত ছোটে
দু’বেলা অন্নের খোঁজে বিষন্নতা দেহ টুটে।
পথে ঘাটে থাকা দুর্গা ক্ষুধার জ্বালায় মরে
অসুর শকুনে তাকে আঁছড়ে খাবলে ধরে।
জগৎ সংসারের অসুর নিধন... করবে বলো কে?
আশীর্বাদী দৃষ্টি দিয়ে, মুছে দাও মনের পশুকে।
ঘরে বাইরে দুর্গার মুখে হাসি ফুটবে কবে?
তোমার পুজা সবার তরে সত্যি হবে তবে!
দুর্বল মন তোমার পানে নিত্য ছুটে চলে
আশা–নিরাশায় বাঁধা বুক অতলান্ত বলে।
নিরাশ করো না কভু তুমি কর্মের বাঁধনে বেঁধে রাখো
ভন্ড অসৎ দুষ্ট পাপীর, বিনাশে একটু ফিরে দেখো।।

শ্যামলী, ঢাকা।। তারিখ–২২.০৯.২০২৩

নিরামিষ কেউ খাইতে পারে না–শ্রীরামঠাকুর

সঞ্জীব কুমার দাস

নিরামিষ শব্দটির আভিধানিক অর্থ আমিষহীন, আমিষের অভাব। অর্থাৎ মাছ, মাংস, ডিম বর্জিত খাবার। আসলে নিরামিষ সংজ্ঞাটিই অসম্পূর্ণ মনে হয়। আমিষ দুই প্রকার– প্রাণীজ আমিষ আর উদ্ভিদ আমিষ। প্রাণীজ আমিষ ব্যতীত মানবদেহ রক্ষা কষ্টকর। তথাকথিত নিরামিষভোজীগণ মাছ, মাংস, ডিম খান না বটে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে দুধ, দধি, ঘৃত, ছানা, মাখন, পনির খেয়ে থাকেন। দুগ্ধজাত পদার্থ মাত্রই প্রাণীজ খাবার। অজ্ঞাত কারণে তা নিরামিষ শ্রেণীভুক্ত রাখার যুক্তিযুক্ত উত্তর খুঁজে পাওয়া ভার। অথচ এ নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায় আদা নুন খেয়ে মাঠে নেমেছে নিরামিষ ভোজী আর প্রসাদ ভোজী বানাতে। হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি প্রসঙ্গে একটি ব্যঙ্গাত্মক প্রবাদ সমাজে প্রচলিত– হিন্দুর আচার আছে বিচার নাই।

নিরামিষ প্রসঙ্গে নামাবতার ভগবান শ্রীরামঠাকুর কি বলেছেন তা আলোচনা করা যেতে পারে। এক ভক্ত নাম নিয়ে ঠাকুরকে বললেন– বাবা আজ থেকে তো আমার নিরামিষ খেতে হবে।

ঠাকুর– ক্যান?
দীক্ষা নিলাম তাই।
ঠাকুর শুনে বললেন– নিরামিষ কেউ খাইতে পারেনা।
দীক্ষা নিলাম নিরামিষ খেতে হবে না?

ঠাকুর বললেন– নাম নিলেন কিন্তু নামও পান নাই। যেমন বাজার থাইক্যা একটা মাছ কিনেই বলতে পারেন না মাছটা খাওয়া হইছে সুস্বাদু। এর পিছনে শ্রম দিতে হইব। মাছটা কাটতে হইবো। আঁশ ছাড়াইতে হইবো, ধুইতে হইবো, রান্না করতে হইবো, কাঁটা ছাড়াইতে হইবো তারপর জিহ্বা দিয়া আস্বাদন করলে বলতে পারবেন মাছটা সুস্বাদু, বেশ খাওয়া হইল। তেমনি নাম নিলেন, ভাল লাগুক মন্দ লাগুক নাম করতে করতে নামে রুচি হইবো। নাম ছাড়তে ইচ্ছা করবো না। নামে রুচি হইবো, ভক্তি হইবো, প্রেম হইবো তখন গুরু কৃপায় ইষ্টদেবের দর্শন হইবো। এই দর্শনকে বলে দীক্ষা। দীক্ষা শব্দের অর্থ হলো দর্শন।

তারপর ঠাকুর বললেন– বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্র বসুর নাম শুনছেন? তিনি হাতে কলমে প্রমাণ কইরা দিচ্ছেন গাছেরও প্রাণ আছে। ঐ প্রাণ বধ না কইরা কেহ খাইতে পারেনা। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নাম শুনছেন? ঐ যন্ত্র দিয়া দেখলে এক গ্লাস জলে সহস্র প্রাণ। যখন ঐ জল পান করেন তখন পেটে গিয়া ঐ সহস্র প্রাণ বধ হয়। শাক খাইবেন শাকেও রজ গুণ আছে।

বাস্তবে আমরা কি দেখি। যারা নিরামিষ খান তারা আতপ ভাত খান। আতপ চাউল তৈরি করতে হলে শুকনো ধানের খোসা (চামড়া) তুলে অর্থাৎ প্রাণ বধ করে রান্না করতে হয়। সিদ্ধভাত যারা খান ধানগুলো গরমজলে সিদ্ধ (প্রাণ বধ) করে শুকিয়ে ভাত রান্না করে খান। যারা ভাত বাদ দিয়ে আটা, ময়দা, সুজির খাবার যাঁতাকলে গম চূর্ণ করে খান। যদি এই ধান ও গমগুলোকেই সামান্য জলে ভিজিয়ে ঘরের কোণে রাখা হত তাহলে ক'দিন পরে দেখা যেত কি সুন্দর প্রাণের বহিঃপ্রকাশ। অথচ আমিষ– নিরামিষ এবং প্রসাদ ভোজের নামে প্রতিনিয়ত প্রাণ বধ চলছে না কি?

শাস্ত্রে আছে–

"প্রাণোহি ভগবানীশ প্রাণ বিষ্ণু পিতামহ। প্রাণেন ধার্য্যতে লোকাঃ সর্বপ্রাণময়ং জগত ॥"

অর্থাৎ– প্রাণই ভগবান, প্রাণই বিষ্ণু, প্রাণই পিতামহ ব্রহ্মা প্রাণই জগত ধারণ করে আছে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব প্রাণময়।

শাস্ত্রে আরো আছে– 'জীবো জীবস্য জীবনং'– এক প্রাণী অন্য প্রাণীকে আহার করে জীবন ধারণ করে। নিরামিষাশী যিনি তিনিও উদ্ভিজ্জ শষ্যভোজী। শষ্যবীজেও প্রাণ রয়েছে। তরকারীতে মায়েরা ফোঁড়ন দিতে তেল গরম করে তাতে শষ্য ফোঁড়ন দেন। তেল যত উত্তপ্ত হয় ফোঁড়ন তত উচ্চস্বরে আর্তনাদ করে। একই তেল ঠাণ্ডা অবস্থায় ফোড়ন আর্তনাদ করে না।

হিন্দু মাত্রই জানেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা গোপালের প্রিয় ভোগ্য বস্তুই হলো দুধ, দধি, ক্ষীর, ঘৃত, ছানা, মাখন ও পনির। এগুলো সবই প্রাণীজ আমিষজাত। তার মধ্যে দধি তৈরি করতে হলে দুধকে ৪৫ ডিগ্রী তাপে একটু সঞ্চার দিয়ে এক ঘণ্টা রেখে দিতে পারলেই গাঢ় দধি তৈরি হয়। যে সঞ্চার (দধি) প্রচুর ব্যাকটেরিয়া যার নাম Lacto Bacillus যা সেকেন্ডে সেকেন্ডে বংশ বৃদ্ধি করে। যে দধিতে যত বেশী ব্যাকটেরিয়া জন্মে থাকে সে দধি তত গাঢ় চাকা হয় । গোবিন্দকে নিবেদন করতে তত আনন্দ পাওয়া যায়। এ আনন্দের পিছনে যে লক্ষ কোটি ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি বা অবদান তা আমরা ভেবে দেখিনা।

যেকোন দেবভোগ্য উপাদানে মুখ্য ভূমিকা চিনির। চিনি তৈরির প্রাচীন পদ্ধতিতে চিনিকলগুলোতে প্রাণীজ

হাড়ের গুঁড়া প্রয়োজন হতো। আধুনিক পদ্ধতিতে তরল চিনি আমদানী করে তা বড় কড়াইতে (বয়লার) জ্বাল দিয়ে দানাদার করা হয়। জ্বাল দেবার আগে সেই বিশাল বয়লারের তলায় ট্যালো tallow বা শক্ত প্রাণীজ চর্বি বা মেদ মাখিয়ে নেওয়া হয় যাতে পোড়া না লাগে। এই tallow অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সারা বিশ্বে বেশীরভাগ সরবরাহ করে থাকে।

মায়েরা শুচি শুদ্ধ হয়ে ঠাকুরের ভোগ রান্না করতে যান। প্রথমে দাঁত ব্রাশ করে গায়ে সাবান মেখে স্নান সেরে গায়ে ক্রীম লোশন ইত্যাদি মেখে ঠাকুর প্রণাম করেই ভোগ রান্না করতে যান। টুথপেস্ট, ক্রীম, সাবান বা চিনি সব কিছুতেই tallow'র উপস্থিতি, মাত্রার হের ফের মাত্র।

ভিটামিন ই-১২ দিয়ে বাত ও ব্যাথার ঔষধ তৈরি করতে, বি-১২ পাউডার প্রক্রিয়াজাত করতে প্রাণীজ টাটকা লিভার প্রয়োজন হয়। নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার পর তার নির্যাস থেকে ই-১২ ট্যাবলেট, সিরাপ বা ইনজেকশান তৈরি হয়।

পুকুর বা নদীতে মাছ ব্যতীত অন্যান্য বর্জ্য মিশ্রিত থাকে। নলকূপে গরু বা মহিষের মোটা চামড়া দিয়ে বাকেট তৈরি হয়। ঐ বাকেটের চামড়া ভিজানো জল দিয়ে নিরামিষ রান্না হয়। এসব আমাদের অনেকেরই জানা নেই। জানা থাকলেও আচার আছে বিচার নেই। কিন্তু আমিষ বা নিরামিষ নিয়ে কথার ফুলঝুরি চলছেই।

শ্রীভগবান গীতায় নবম অধ্যায়ে ২৭ নং শ্লোকে বলেছেন-
"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাদি সৎ
যৎ তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎকুরুস্ব পদর্পণম্ ॥

হে অর্জুন তুমি যা কর্ম কর, যা আহার কর, হোম কর, যা দান কর এবং যে তপস্যা কর তা সব আমাকে অর্পণ কর। এই শ্লোকে শ্রীভগবান যদশ্নাসি অর্থাৎ যা আহার কর বললেন। যদ্ নিরামিষ অশ্নাসি বলেননি।

এবার শ্রীরামঠাকুরের কথায় আসা যাক! তিনি বললেন "নিরামিষ কাকে বলে? নির্নিমেষ নেত্রে ইষ্ট দেবের দর্শন, স্মরণ মনন। যা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। একমাত্র শ্রীমতী রাধারাণীর পক্ষেই কিছুটা সম্ভব। কারন তিনি বলেছিলেন, হে গোবিন্দ অনন্তরূপ। সেই অনন্তরূপ দর্শন করার জন্য আমাকে অনন্ত আঁখি দাওনি। দুটি মাত্র আঁখি দিয়েছো তাতেই আমি তোমায় দেখে দেখে সন্তুষ্ট থাকতাম। কিন্তু তাতেও পলক দিলে তাতে কি করে নিরন্তর দেখবো? ছেদ পড়ে যায়।

চৈতন্য চরিতামৃতে রাধারাণীর আক্ষেপ-
"কোটী নেত্র নাহি দিলে সবে দিলে দুই।
তাতেও পলক দিলে কি দেখিমু মুই ॥"

সামান্য চক্ষের পলকের জন্য দর্শনে ছেদ তাঁর অসহ্য। কাজেই নিরামিষ নিয়ে বৃথা মাতামাতি না করে গোবিন্দের নিরন্তর স্মরণ, মনন নিয়ে যুক্ত থাকাই যুক্তিযুক্ত।

সবশেষে শ্রীরামঠাকুর বলেছেন "যে জিহ্বা দিয়া নিরামিষ খাইবেন সেইটাও মাংসের তৈয়ারি। মাংসের রস বাহির না হইলে নিরামিষ গিলন যায়না।"

জয় শ্রীরাম।
('শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী' এর লেখা থেকে সংগৃহিত)

nahee
SS PIPE
TIMELESS BEAUTY
পরিবেশ বান্ধব
ক্ষয় ও মরিচা প্রতিরোধক
Nahee SS Pipe
CORPORATE OFFICE: House-26, Road-03, Block-i, Banani, Dhaka-1213.
Tel : +88-02-9871401, 9871402, Fax : +88-02-9870824
FACTORY: Abdar, Telehati, Sreepur, Bazipur, Bangladesh.

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা, প্যাঁচা ও লক্ষ্মীছাড়া

চিররঞ্জন সরকার

দুর্গাপূজা শেষে শুরু হয় লক্ষ্মীর আরাধনা। বাঙালির ঘরে ঘরে প্রতি বৃহস্পতিবার পূজিত হন মা লক্ষ্মী। কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা আসলে আশ্বিনের ভরা পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয়। শরৎকালের পূর্ণিমার রাত্রি বৎসরের সবচেয়ে উজ্জ্বল রাত্রি। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী এই রাতে ধনসম্পদ, প্রাচুর্য, সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধির দেবী লক্ষ্মী বিষ্ণুলোক হতে পৃথিবীতে নেমে আসেন এবং মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে 'কে জেগে আছ?' এই প্রশ্ন করেন।

কোজাগর শব্দটির মধ্যেই রয়েছে এক দ্যোতনা। কোজাগর মানে 'কে জেগে রয়'? যে কারণে ঘুমে লক্ষ্মী হন বিরূপা, জাগরণে লক্ষ্মীর কৃপা। সরস্বতী তাঁর বোন আর কার্তিক-গণেশ তাঁর ভাই। আবার লক্ষ্মী রূপেরও দেব। ধনেরও দেবী। কিন্তু পুরাণ মতে, লক্ষ্মী দেবসেনা হিসাবে জন্মান, অনেকে আবার লক্ষ্মীকে গণেশের স্ত্রী রূপেও বর্ণনা করেছেন।

লক্ষ্মীপূজার নানা সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে এক বিশেষ উপাচার আলপনা। বাংলা 'আলপনা' শব্দ এসেছে সংস্কৃত 'আলিমপনা' থেকে, যার অর্থ আস্তরণ প্রদান করা। পূজার আগের দিন আতপ চাল ভিজিয়ে রেখে পরদিন তা মিহি করে বাটার নিয়ম। বাড়ির সদস্যরা চালবাটা ও জল মিশিয়ে তৈরি করেন এক মসৃণ গোলা। এরপর একটুকরো ন্যাকড়া হাতের মধ্যে দিয়ে পিটুলিতে ডুবিয়ে মেঝেয় ফুটিয়ে তোলেন ভিন্ন লতাপাতার আঁকিবুকি। লক্ষ্মীপূজায় আলপনার প্রধান মোটিফ হল দেবীর পা। কোজাগরীর শুভক্ষণে বাঙালি হিন্দুর ঘরদোর উঠোন-সিঁড়ি সেজে ওঠে দুধসাদা পায়ের ছাপে। বাড়ির সদর দরজা অথবা পিছনের ঘুপচি দোর-মা লক্ষ্মী যেন সবসময় ঘরের ভিতরে ঢুকছেন-এভাবেই দেবীর পা আঁকার নিয়ম।

মা লক্ষ্মী চঞ্চলা, তাকে স্থির করে, তুষ্ট করে, ধন-ঐশ্বর্যের আশীর্বাদ কামনা করাই পূজার উদ্দেশ্য। লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ তাই গৃহস্থের ঘরে ধনাগমের প্রত্যাশার প্রতীক। কলমিলতা, ধানের শীষ, পদ্মপাতা, প্যাঁচা, শঙ্খলতা, সূর্য, লাঙল, মই, পানপাতা, সিঁদুরকৌটোও আলপনায় ফুটে ওঠে। এই সমস্ত 'মোটিফ' আদতে বাংলার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত জিনিসের প্রতিচ্ছবি। লাঙল, ধানের শীষ ভাল ফসলের কামনায় আলপনায় ফুটিয়ে তোলা হত। তেমনই আনুষঙ্গিক যা কিছু শুভ তা-ই ফুটে ওঠে পূজার দিন।

লক্ষ্মী হলেন ধনদেবী। মা লক্ষ্মী-ধনসম্পদের ঝুঁড়ি নিয়ে ঘর আলো করে থাকেন। বাঙালি হিন্দুরা মেতে উঠে তাঁর আরাধনায়-লক্ষ্মীর কৃপা পাওয়ার আশায়। ফলমূল-নৈবেদ্যর পাশাপাশি অবশ্যই থাকতে হবে বিভিন্ন স্বাদের নাড়ু। মূলত নারকেল, চিনি ও এলাচের মিশ্রণে তৈরি হয় নারকেল নাড়ু। এছাড়া তিলের নাড়ু ও ক্ষীরের নাড়ু। নাড়ু না-হলে লক্ষ্মীপূজা জমে না। নাড়ু কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ গোপালের প্রিয়। ইনি নারায়ণের আরেক রূপ বলে আমরা জানি। আর নারায়ণই আবার লক্ষ্মীর স্বামী। তবে কি পতির প্রিয় খাবার বলেই নাড়ুকে লক্ষ্মী পূজার কম্পালসারি আইটেম বানানো হয়েছে?

কে জেগে রয়? নিশুত রাতে কোজাগরী পূর্ণিমার আলোয় মা লক্ষ্মী নাকি এমন ভাবেই দোরে দোরে কড়া নাড়েন। তা এই একরাতের 'নাইট গার্ড'-এর কাজটি খুব সহজ সাদাসিধে নয় মোটেই, অন্তত দেবীচক্ষে। ভাগ্যিস নিশাচর প্যাঁচা সঙ্গে ছিল! ড্যাবডেবে চোখওলা দুধসাদা বাহনটি দিনের বেলা তালকানা, এগাছ-ওগাছ হাতড়ালে কী হবে! সূয্যি ডুবলেও চোখেই যেন একশো পাওয়ারের বাল্ব জ্বলে ওঠে। বার্ডস আই ভিউতে তখন আঁধার চিরে জরিপ করে নেয়-কোন সংসারে বাড়ন্ত হল ধানের ছড়া? কোন গেরস্থর উঠোন জুড়ে ধনধান্য পুষ্প ভরা? আঁধার রাতের ওয়াচম্যান এই লক্ষ্মীপ্যাঁচাই তাই মা লক্ষ্মীর আসল পি.এ। এক্সিকিউটিভ ম্যানেজার কাম ড্রাইভার। চাঁদনি রাতে সে ধবধবে পাখা মেলেছে কি গেরস্থ বরণডালা, সিঁদুর, আসন-পিঁড়ি নিয়ে প্রস্তুত।

লক্ষ্মীর বাহন কেন প্যাঁচা, এ বিষয়ে ধর্মে বলা হয়েছে, যিনি জাগতিক মায়া মোহ উপেক্ষা করে সাধনার ব্রত নিয়ে নির্জনে সেবাকাজে আত্মোৎসর্গে ব্রতী হবেন তিনি লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি লাভ করবেন। প্যাঁচা দিনে ঘুমায়, রাতে জেগে থাকে। নিদ্রা ও জাগরণ দিয়ে সে পরমার্থকামী সাধক-সাধিকাদের অনুকরণের যোগ্য। প্যাঁচা গোপনচারী। অতি গোপনে এরা বাস করে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। সাধকের সাধনাও দৃশ্যমান জগতের বাইরে হওয়া উচিত।

তা ছাড়া প্যাঁচা ধান রক্ষা করে। ধান যা মানুষের আহার, তার শত্রু ইঁদুরদের সংহার করে সে ধনরক্ষার ব্রত পালন করেছে। যা মানব হিতৈষীর কাজে লাগে।

কিন্তু কোথায় আজ মা লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচা? আজকের যুগে এই 'জনারণ্যে' এমনকি গাছ-গাছালির কোটর খুঁজে-খুঁজে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়েও তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শহরে তো নেই-ই, গ্রামেও আর তেমন একটা লক্ষ্মীপ্যাঁচা দেখা যায় না। তবে প্যাঁচার সঙ্গে আমরাও 'লক্ষ্মীছাড়া' হতে চলেছি?

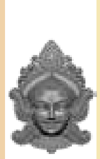

দুর্গাপূজা ও বাঙালির জীবন

দীপান্বিতা কর্মকার

পূজা ও উপাসনার অর্থ হলো ঈশ্বরকে অবলম্বন করে জীবনকে এগিয়ে নেওয়ার প্রয়াস। ঈশ্বরকে মাতৃভাবে পূজা ও উপাসনা করা সনাতন সংস্কৃতির অনন্য বৈশিষ্ট্য। শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা মাতৃভাবে ঈশ্বরের উপাসনা ও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মানুষ্ঠান হিসেবে সুপরিচিত।

দুর্গা পৌরাণিক দেবতা। তিনি আদ্যাশক্তি, মহামায়া, শিবানী, ভবানী, দশভুজা, সিংহবাহনা ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। দুর্গ বা দুর্গম নামক দৈত্যকে বধ করেন বলে তাঁর নাম হয় দুর্গা। জীবের দুর্গতি নাশ করেন বলেও তাঁকে দুর্গা বলা হয়। ব্রহ্মার বরে পুরুষের অবধ্য মহিষাসুর নামে এক দানব স্বর্গরাজ্য দখল করলে রাজ্যহারা দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণুর নির্দেশে সকল দেবতার তেজঃপুঞ্জ থেকে যে দেবীর জন্ম হয় তিনিই দুর্গা। দেবতাদের শক্তিতে শক্তিময়ী এবং বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিতা হয়ে এ দেবী যুদ্ধে মহিষাসুরকে বধ করেন। তাই দেবীর এক নাম হয় মহিষমর্দিনী।

দুর্গাপূজা বাঙালি হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। তবে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অবাঙালিরাও ভিন্ন ভিন্ন নামে এ উৎসব পালন করে। যেমন কাশ্মীর ও দাক্ষিণাত্যে অম্বা ও অম্বিকা, গুজরাটে হিঙ্গুলা ও রুদ্রাণী, কান্যকুব্জে কল্যাণী, মিথিলায় উমা এবং কুমারিকা প্রদেশে কন্যাকুমারী নামে দেবীর পূজা ও উৎসব পালিত হয়।

পুরাণকথন অনুযায়ী, সূর্যের দক্ষিণায়নে দেবতারা থাকেন নিদ্রিত, উত্তরায়ণে জাগ্রত। শরতে দেবতাদের বিশ্রামের পালা। শ্রীরামচন্দ্র দুষ্ট রাবণকে বধের জন্য বিশ্রামের সময় দেবী দুর্গাকে জাগিয়ে পূজা করেছিলেন, দুর্গাপূজার প্রারম্ভিক অঙ্গানুষ্ঠান তাই অকালবোধন নামে পরিচিত। তারই ধারাবাহিকতায় শরতে দুর্গাপূজার প্রচলন। শাস্ত্রমতে, শ্রীশ্রী দুর্গাপূজায় সাতটি কল্প (প্রকার) থাকলেও আশ্বিনের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত কল্পে (তৃতীয় কল্প) বিহিত পূজা সর্বাধিক প্রচলিত। বিবিধ অঙ্গানুষ্ঠানের বৈচিত্র্যময় সমাবেশ, বিশেষত স্নাপন (স্নান), পূজন, বলি ও হোমড়এ চারটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যের আয়োজন, তাই এ পূজানুষ্ঠান মহাপূজা। পূজার প্রতিটি অঙ্গানুষ্ঠান পৃথক পৃথক তাৎপর্যমণ্ডিত। তন্মধ্যে, স্নাপন, পূজন, বলি ও হোমের তাৎপর্য প্রসঙ্গত আলোচনা করা যেতে পারে।

নবপত্রিকা (নয়টি বৃক্ষের অঙ্গাংশ নিয়ে তৈরি নবপত্রিকা দেবী দুর্গারই জগৎরূপ) ও দেবী দুর্গার মহাস্নান পর্বে বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন প্রকারের জল ও মাটি দিয়ে দেবতাকে দর্পণে স্নান করানো হয়। স্নানের উদ্দেশ্য– শুদ্ধতা ও পবিত্রতা সম্পাদন, এটা স্বতঃসিদ্ধ। দেবী তো শুদ্ধতা ও পবিত্রাস্বরূপিণী, তাঁকে আবার স্নান করিয়ে শুদ্ধ করার প্রয়োজন কী ? প্রকৃতপক্ষে, সংসারের বিষয়-চিন্তায় আমরা জগজ্জননীকে ভুলে থাকি। আমাদের মন বিষয় মলিনতায় অশুদ্ধ থাকে। পুষ্পজল দিয়ে স্নান করাতে করাতে সাধক পূজারির চিন্তন ও মন্ত্রোচ্চারণ– ‘মৃত্তিকাস্থিত হে কচ্চি (কচুগাছ-নবপত্রিকা দুর্গার অঙ্গ), তুমি সর্বসিদ্ধি প্রদায়িনী, দুর্গারূপে স্নাত হয়ে তুমি বিজয় দান করো।’ জল ও মৃত্তিকা দিয়ে স্নান করানোর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রূপ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত দেবীকেই চিন্তন করা হয়। স্নানে পবিত্রাস্বরূপিণী মাকে চিন্তনের মধ্য দিয়ে বিষয়দুষ্ট মনকেই শুদ্ধ ও

পবিত্র করার প্রয়াস পান সাধক। রাজদ্বার থেকে বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা, শিশিরজল থেকে সাগরজল জগতের সর্ব ক্ষেত্রের জল ও মাটি দিয়ে স্নান করানোর মধ্য দিয়ে সর্বত্র তিনিই ব্যাপ্ত হয়ে আছেন এরূপ ভাবনা ও উপলব্ধির প্রয়াস পান সাধক। স্থান পবিত্র ও পরিষ্কার থাকলে তবেই বসবাসের উপযোগী হয়, দেবতার আসন গ্রহণের জন্যও হৃদয় মন্দির পবিত্র ও শুদ্ধ হওয়া চাই। স্বচ্ছ জলালয়েই প্রতিবিম্ব স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়।

শ্রী রামকৃষ্ণ বলেন, ‘তিনি (ঈশ্বর) বিষয়বুদ্ধির অগোচর, কিন্তু শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি আর শুদ্ধ আত্মাড়একই জিনিস।’

ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে অনুষ্ঠেয় সাধারণ কিন্তু অত্যাবশ্যক অঙ্গানুষ্ঠান ষোড়শোপচারে (আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বন্দনা) পূজা হয়। গৃহে কোনো শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি এলে নানা আয়োজনে তাঁকে অভ্যর্থনা করা হয়, তাঁর পছন্দের দ্রব্যাদি দিয়ে যত্নের সঙ্গে সেবা করা হয়, তাঁকে আনন্দ দেওয়ার ও তাঁর প্রীতলাভের চেষ্টা করা হয়, জগন্মাতার আগমনে পূজায়ও যেন তদ্রুপ।

শাস্ত্রজ্ঞরা বলে থাকেন, ভক্তিসহকারে এসব উপচারদ্রব্য উপাস্য দেবতাকে সমর্পণ করলে তা সাধককে দেবসন্নিধানে নিয়ে যায় বা বাঞ্ছিত ফলকে নিকটে এনে দেয় বলে উল্লিখিত দ্রব্যাদিকে উপচার বলা হয়।

পূজারি-সাধক বাইরে যেসব দ্রব্য প্রতিমাকে নিবেদন করেন, মনে মনেও সেসব চিন্ময়ী মাকে নিবেদন করেন।

অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে সন্ধিপূজায় বলির অনুষ্ঠান। বলিতে সাত্ত্বিক, রাজসিক, স্থুল, সূক্ষ্ম (মনোবৃত্তি) ইত্যাদি প্রকারভেদ আছে। সাত্ত্বিক পূজারি বলির মাধ্যমে মনে মনে (সূক্ষ্মভাবে) কামাদি রিপুর বিনাশ চিন্তা করেন। হোম মহাপূজার অন্যতম অঙ্গানুষ্ঠান। হোমের স্থুল, সূক্ষ্ম ইত্যাদি প্রকার রয়েছে। হোমের লক্ষ্য ভেদবিলোপ। স্থুল হোমে যেমন হোমকাষ্ঠ, ঘৃত, পুষ্প, ফলাদি বিভিন্ন হোমদ্রব্য অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে অগ্নিময় হয়ে যায়, তেমনি সূক্ষ্ম হোমে দ্রবণীয় দ্রব্যের অর্পণ, ঘৃত, হোমাগ্নি, আহুতিদানের কর্তা, হোমক্রিয়া, হোমে প্রাপ্তব্য ফলকে উপাস্য (ব্রহ্ম) থেকে অভিন্নজ্ঞান করেন পূজারি সাধক।

ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্যমণ্ডিত অঙ্গানুষ্ঠানের সন্নিবেশে অনুষ্ঠেয় এ পূজা যেন এক নিরন্তর ধ্যানপরায়ণতা, তাঁরই (ভগবতীরই) শরণাগত হওয়ার এবং তাঁরই সান্নিধ্য বা স্বরূপ লাভের প্রয়াস। পূজানুষ্ঠান চার বা পাঁচ দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে পূজার অন্তর্নিহিত ভাব জীবনে চালিকা শক্তি ও সাধনার উপাদানস্বরূপ মনে করেন সাধকেরা। তত্ত্বজ্ঞ সাধকের কাছে জীবনটাই পূজারূপে পরিগণিত হয়।

ভক্তের ভাব- মায়ের প্রতি শিশুর সম্পর্কের ভাব। শিশু যেন সর্বদা মায়ের শরণাগত, মায়ের সঙ্গে যুক্ত সব সময়। ভাবে, মা আছেন, সঠিক পথ দেখিয়ে দেবেন; মা আমার হাত ধরে আছেন, অতএব কোনো ভয় নেই। শরণাগত ভক্ত মায়ের সন্নিধানে যুক্ত থেকে জয় করেন ভয় ও বিপর্যয়কে। সাধারণের তত্ত্ব নয়, ফল প্রত্যাশিত। শাস্ত্র আশ্বস্ত করছে, এ পূজায় ধর্ম, অর্থ, কাম, মোহ-চতুর্বর্গ ফল লাভ হয়। শ্রীশ্রী চণ্ডীর আখ্যানে আছে, মহামায়ার কৃপায় রাজা সুরথ হৃত রাজ্য ফিরে পেয়েছিলেন।

জগৎসংসারের দুঃখ-ভয়ও আমাদের ব্যথিত ও বিপর্যস্ত করে। তত্ত্বজ্ঞ সাধক বিচার করে দেখেন, পরিবর্তনশীল জগতের সবই ক্ষণস্থায়ী, এই আছে, এই নেই যেন স্বপ্নবৎ, তাই জাগতিক ঐশ্বর্য তাঁর কাছে প্রত্যাশিত নয়। জগৎরূপ স্বপ্ন বা ভ্রম থেকে মুক্তি চান তিনি। জগন্মাতাও সাধকের অভীষ্ট অনুসারে ভ্রম বা স্বপ্ন দূর করে দেন। সাধক উপলব্ধি করেন এক মা-ই সর্বত্র বিরাজিতা, নিজেও মা থেকে অভিন্ন।

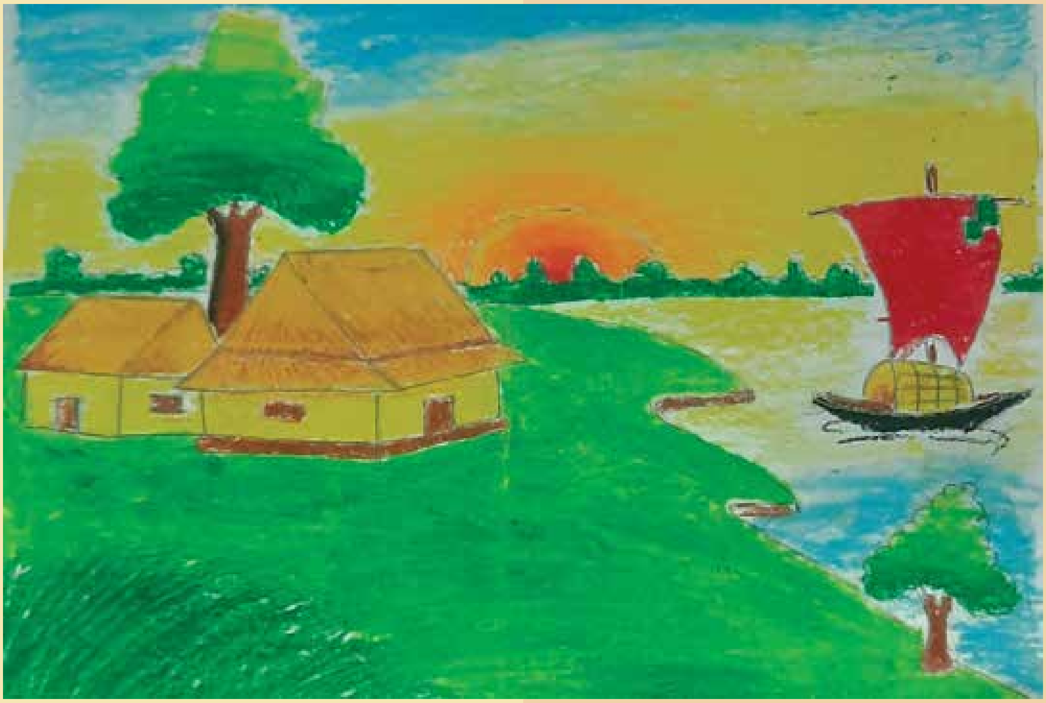

ছবি : তন্ময় সেন

আনন্দময়ীর আগমনে

কাজী নজরুল ইসলাম

আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।

দেব-শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবকদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা, আসবি কখন সর্বনাশী?

মাদীগুলোর আদি দোষ ঐ অহিংসা বোল নাকি-নাকি
খাঁড়ায় কেটে কর মা বিনাশ নপুংসকের প্রেমের ফাঁকি।

ঢাল তরবার, আন মা সমর, অমর হবার মন্ত্র শেখা,
মাদীগুলোয় কর মা পুরুষ, রক্ত দে মা রক্ত দেখা।

তুই একা আয় পাগলী বেটী তাথৈ তাথৈ নৃত্য করে
রক্ত-তৃষার 'ময়-ভুখা-হু'র কাঁদন-কেতন কণ্ঠে ধরে।-
অনেক পাঁঠা-মোষ খেয়েছিস, রাক্ষসী তোর যায়নি ক্ষুধা,
আয় পাষাণী এবার নিবি আপন ছেলের রক্ত-সুধা।
দুর্বলেরে বলি দিয়ে ভীরুর এ হীন শক্তি-পূজা
দূর করে দে, বল মা, ছেলের রক্ত মাগে দশভুজা।...

'ময় ভুখা হুঁ মায়ি' বলে আয় এবার আনন্দময়ী
কৈলাশ হতে গিরি-রাণীর মা দুলালী কন্যা অয়ি!

ঈশ্বরের কাছে দেবতার আহ্বান

অশোক ধর

আচ্ছা এমন কি
একদিন আসবে না
যখন স্বর্গের দেবতাগুলো
মর্তে এসে দেখে গিয়ে
ঈশ্বরকে বলবে,
তোমার সৃষ্টির সেরা জীব
মানুষগুলো এখন মানুষ হয়েছে।
মানুষরা এখন স্বার্থের জন্যে হানাহানি, মারামারি করে না,
মানুষগুলো এখন সম্পূর্ণরূপে মানুষ হওয়াতে
পৃথিবীতে এখন আর কোনো মানুষ না খেয়ে থাকে না।
মরে না, বিনা চিকিৎসায় থাকে না।
অন্নহীন, বস্ত্রহীন, শিক্ষাহীন,
বাসস্থানহীন থাকে না।
ঈশ্বর তোমার পৃথিবীতে
এখন আর মানব-বিধ্বংসী কোনো
মারণাস্ত্র; ট্যাংক, বোমা, গুলি, টিয়ার গ্যাস
কোনো কিছুই নেই।
কোনো মিথ্যা নেই, হিংসা নেই,
বিদ্বেষ নেই, ভেদাভেদ নেই
হানাহানি নেই, মারামারি নেই।
আছে শুধু মানুষে মানুষে
মায়া-মমতা-ভালোবাসা,
সমস্ত পৃথিবীতে মানুষগুলোর মায়া-মমতায়
ভালোবাসার কারণে আজ তোমার সৃষ্টির সকল জীবকুল,
নিরাপদ আকাশ, বাতাস, নদীনালা
সাগর-মহাসাগর, গিরি-পর্বত সব যেন আরেক স্বর্গভূমি
হে ঈশ্বর।
তুমি আমাদেরকে এখন
মনুষ্যালয়ের এই স্বর্গভূমিতে পাঠিয়ে দাও।
আমরা দেবতারা
মনুষ্যালয়ের
এই স্বর্গভূমিতে এখন
বসবাস করতে চাই।

কর্মে কেন অমানুষ

অশোক ধর

জন্ম হয় মানুষরূপে
কর্মে কেন হয় অমানুষ।
বলোরে মানুষ তোমরা বলো
কেনরে তোমরা হও অমানুষ?

কবিগুরু বলেছিলেন–
জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, হৃদয়
মানষ তারা মানুষ হয়
মানবিকতা না থাকলে
আসলে কি সে মানুষ হয়?

আল্লাহ, গড, ভগবান
মানুষরূপে পাঠায় মানুষ দুনিয়ায়
স্বার্থের কারণে ভুলের কারণে
কর্মে কেন হও অমানুষ?

কত গান কত কবিতা কত লেখা
জগতের জন্য পাঠিয়েছেন ভগবান
কেনরে মানুষ হও যে অমানুষ
বলতে পার বুঝতে পার
কর্মের কারণে তোমরা অমানুষ?

জন্ম হলে মৃত্যু হবে
এটাই হলো স্বাভাবিক
মানুষরূপে জন্ম হয়ে
কর্মে কেন হও অমানুষ?

ভাগ্যদেবী

কল্যাণ চক্রবর্তী

ভাগ্যদেবী ক্ষুব্ধনেত্রে রইল চেয়ে আমার দিকে
আর কতো চাও ওরে ছোকড়া অতি আশা বড়ই ফিকে
বলছি মাগো, ওঠার সিঁড়ি দিলেই যখন উঠতে দেওনা ছাদের পরে
বিশ্বটাকে আনব তুলে আপন হাতের মুঠোয় ভরে।
বলছে মাগো, ওরে বাছা আশার ঘোড়ায় লাগাম টানো
নিয়তি নামক শক্তিমত্তা তাড়িয়ে বেড়ায় এবার তুমি সেটাই মানো
ইচ্ছে করলেই পারছিনারে তোমার জন্যে স্বর্গ দিতে
মর্ত্যভূমে অযুতকোটি হাত পাতে যে লুটে নিতে।
বলছি মাগো, দেবের কি আর অভাব আছে তালবাহানা করছ কেন
ইচ্ছে হলেই নিজের হাতে গড়তে পার অট্টালিকার পাহাড় যেন
বিশ্বজুড়ে কতো সম্পদ তোমার হাতে করছে খেলা
এসব যেন রইছে পড়ে চৈত্র মাসের শক্ত ঢেলা।
ওরাই তোমার হীরক সোনা দামী কতো কাম্যবস্তু
ডলার টাকা পাউন্ড ইউরো সবই রইছে কল্যাণস্তু
হাতটা একটু ঝেরে দিলেই ঘরটা আমার ভরে যে মা
সুখের পায়রা উড়বে নাচবে ভাববে নিজে তোমার সেনা।
কতো আশাই করিগো মা কয়টা সোনার মোহর দিলে
নয়তো কয়েক বস্তা টাকা বয়েই আনো চমকে যাক আমার পিলে
ডাক শুনেই মজা লুটবে দেবার বেলা মুষ্টিহাত
বলে রাখছি এসব হলে তোমায় ডাকা পুরো বাদ।
আমায় যদি নাইবা দিলে ভালো বাসতে কেনই গেলে
সন্তান বলে টানলে বুকে আবার বলছ থামরে ছেলে
আমার যে মা চাইগো ধরা তোমায় নিয়ে থাকব সুখে
শান্তি সুধায় ভরবে জীবন তোমায় মাগো ডাকব সুখে।
অভাব নামক নরক থেকে বাঁচাও মাগো এই মিনতি
নইলে কিন্তু ডাকাডাকির সকল কর্মে করবনা আর মাথা নতি
হাসেন মাগো, পাগলা ছেলে নিবিই যখন দিলাম তোরে
কলম ধরে লেখরে বাছা কাব্য সুধায় থাকবি ঘোরে।
টাকায় কিগো সুখ আসে যে টাকার পিছু ছুটছ তোরা
মনের সুখই সুখরে বাবা সামাল দে তোর লোভের ঘোড়া
অল্পে তুষ্ট হ রে বাছা লোভের নেশায় ডুবিস নারে
টাকা টাকা করলে কিন্তু ভাগ্যদেবী তাকে ছাড়ে
দেবার যা তা আমিই দিব তুমি শুধু কর্ম কর।
ফলের আশা ত্যাগ করে তুই কাজের মাঝেই ডুবে পর
আমি কি আর পররে বাছা সন্তান ভুলে থাকব দূরে
কাজের মাঝেই পাবি আমায় আসব আমি জগত ঘুরে।

১৫.০৩.২০২১।

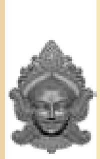

"ছি ! রে গদা ছি !"

মিলেনিয়াম রায় পূজা

ঃ আরে গদা– চললি কোথায়
সাত সকালে তুই?
ঃ যাচ্ছিরে ভাই শ্বশুড়বাড়ি
সংগে নিয়ে পান–সুপারী
আর নিয়েছি দৈয়েরহাঁড়ি
সন্দেশ কেজি দুই!
মাছটা বড় পেলাম নারে
পেয়েছি যা এই বাজারে
বাধ্য হয়েই নিলাম তারে
ছ' কেজির এক রুই!
ঃ শ্বশুড় খাচ্ছেন এতো কিছু
বাবা খাচ্ছেন কি?
বৃদ্ধাশ্রমে কেমন আছেন–
কুলাঙ্গার এক ছেলেরে তুই
ছি রে গদা...ছি!

হাঁড়িতে ভাত নাই

অনন্যা রায় তমা

কি আর বলি– ভাই!
ফাটকা কলে–
আটকা আছি,
শান্তি কোথায় পাই?
মনের কথা বোঝাই কারে
আগুন লাগা এই বাজারে–
নেড়ে হস্ত
উদয়–অস্ত
কষ্ট করে যাই!
দিনের শেষে তবু দেখি–
হাঁড়িতে ভাত নাই!
নুন আনতে পান্তা ফুরায়,
দ্রব্যমূল্য– পাহাড় চুড়ায়!
যতই হাঁপাই–
নাগাল না পাই,
ধরতে কেবল চাই!
হা–হুতাশে কাটছে জীবন,
বাঁচার উপায় নাই!

মা দুর্গার আগমনী

আরতি রায়

দেবী তোমার আগমনের
প্রস্তুতি তাই,
মহেশ তোমায় দিলেন বিদায়
মহিষাসুরের নিধন করে,
চলেই এসো পিত্রালয়ে।

দেবী তুমি আসবে বলে
শিশির বিন্দু ঘাসে
মাঠে মাঠে শোভা বাড়ায়
শুভ্রবরণ কাঁশে...

দেবী তোমার আগমনে
খুশি সবার মন,
মহালয়ার প্রতীক্ষাতে
মগ্ন ত্রিভুবন
মগ্ন দুর্গা দশভূজা...

আসবে সপরিবারে
ছুটির দিনে দেখবো তোমায়
মণ্ডপে বারে বারে।

তোমার অরূপ রূপের
মহিমা করবো অবলোকন...
বল প্রদায়িনী মা গো আমায়
অভয় করো নিবেদন।

মহিষা সুরের সমাপন করে
করেছো তমসা দূর।
আনন্দে মাতে এই ধরাধাম
বাজে আগমনী সুর।

বিঘ্ন হর্তা দেব সেনাপতি
গণেশ আর কার্তিক...
তোমার দুই পুত্রকে এনো
মনে থাকে যেন ঠিক...

আর দুই গুণবতী কন্যা
যারা রূপে আর গুনে অনন্যা
লক্ষ্মী আর সরস্বতী
বাড়াবে তোমার দ্যুতি।

বাহন গুলো ও সংগে এনো
মনে থাকে মাগো যেনো,
ওরা ছাড়া তোমার পূজা
পূর্ণ কি হয় কখনো?

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট-এর গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ

- ভূমির যৌক্তিক ব্যবহার ও সুষম মাত্রার সার প্রয়োগ করে ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে সারদেশে ৪০টি ফিল্ড অফিসের মাধ্যমে দেশের সকল উপজেলার জন্য পর্যায়ক্রমে ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা ও ইউনিয়ন সহায়িকা প্রণয়ন।
- মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে টেকসই কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যে সারাদেশে ২৩ টি গবেষণাগারের মাধ্যমে মাটি পরীক্ষা ও সার সুপারিশ সেবা প্রদান।
- তৃণমূল পর্যায়ে মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে সুষম সার প্রয়োগে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে সারা দেশে ১০ টি ভ্রাম্যমান মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে সার পরীক্ষা সেবা প্রদান।
- সারের গুণগত মান যাচাইয়ের লক্ষ্যে সারাদেশে ১০ টি গবেষণ মাধ্যমে সারের বিশ্লেষণ সেবা প্রদান।
- সুষম সার প্রয়োগসহ অম্লীয় মাটি, লবণাক্ত মাটি, পিট মাটি ও মাটি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ফিল্ড ট্রায়ালের মাধ্যমে কৃষকদের উদ্বু
- লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র, বটিয়াঘাটা খুলনা এব সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা কেন্দ্র, বান্দরবান-এ গবেষণার মা উদ্ভাবন।
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, অ সংস্থা, বেসরকারী সংস্থা ও কৃষি উদ্যোক্তাদের কারিগরি সহায় প্রদান।
- ভূমি ও মৃত্তিকার উপর উপজেলা ভিত্তিক সৃজিত তথ্যভান্ডার ব কৃষকদের জন্য অনলাইন সার সুপারিশ সেবা প্রদান। (www.ofrs.gov.bd), (www.srdi.gov.bd)

SRDI
SOIL RESOURCE DEVELOPMENT INSTITUTE

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
কৃষি মন্ত্রণালয়

দুঃখ কমানোর উপায়

তাপসী দাস

অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিই দুঃখী। কিন্তু অভাবগ্রস্ত নয় এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে? অভাব পূরণের দ্বারা কি অভাবের আগমন ঠেকিয়ে রাখা যায়, না সীমিত করা যায়? আমাদের জীবনে কাল বা সময়কে যেমন ঠেকিয়ে রাখা যায় না তেমনি পৃথিবীর গতিও স্তব্ধ করা যায় না। এই চলমান জগতে নতুনের আবির্ভাব অভাববোধকে জাগিয়ে তোলে। সে সঙ্গেই আমাদের চাহিদার মাত্রা কেবল যোগ হতে থাকে। তাই অভাববোধই দুঃখের কারণ।

তা হলে কি আমরা সুখী হতে পারব না? সুখ জিনিসটি কি? তার সংজ্ঞা কি? ধর্মরাজ যম বকরূপে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। তার মধ্যে দুটি প্রশ্ন অত্যন্ত মূল্যবান আমাদের জীবনে। একটি হলো সুখী কে? অপর হলো আশ্চর্য কি? যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন অঋণী, অপ্রবাসী, স্বোপার্জিত অর্থে দিনান্তে শাকান্নভোজী তিনিই সুখী। অপরটি হলো আমরা প্রতিদিন জীব জগতের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করছি তবুও ভাবছি না যে আমি মৃত্যুবরণ করব। জন্ম হলেই মৃত্যু অবধারিত কিন্তু আমি মরব এ কথা ভাবছি না এটাই আশ্চর্য।

মানুষ কখনও দুঃখ চায় না সুখই তার কাম্য। এই সুখ অন্বেষণেই জীবন অতিবাহিত হয় এবং কর্ম প্রচেষ্টার প্রেরণাও ঐ অনাগত সুখ। অভাববোধই এই অন্বেষণের কারণ। আমরা মনে করি এই অভাব পূরণ হলেই সুখ আসবে কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় অপর একটি অভাব পূর্বের অভাবের হাত ধরে আছে। এই অভাব পূরণ করতে গিয়ে বৈধ পথে না হলে অবৈধ পথে আমাদের চলতে হয়। এই অবৈধ পথই দুঃখকে আমন্ত্রণ করে। বৈধ প্রেম ভালবাসা ভাল কিন্তু অবৈধ প্রেমের আকর্ষণ বেশি। বৈধ আয় থেকে অবৈধ আয়ে প্রাচুর্য বেশি থাকায় আকর্ষণও বেশি। আমরা অতি সহজেই এই আকর্ষণে জড়িয়ে পড়ি। বৈধ প্রেমকে হত্যা করে অবৈধ প্রেমকে গ্রহণ করতে গিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়। এগুলো আমরা প্রত্যক্ষ করি অহরহ কিন্তু মোহ এমন যে তার আকর্ষণ কাটিয়ে উঠতে পারি না বলেই অনাকাঙ্ক্ষিত দুঃখকে অজ্ঞাতসারেই আমন্ত্রণ করি। প্রতিদিনের পত্রিকার পাতা উল্টালেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পরকীয়া প্রেমের ফসল স্ত্রী বা স্বামীর মৃত্যু অথবা যৌতুকের দাবী মেটাতে গিয়ে স্ত্রীর মৃত্যু। দুটোই আপাত সুখের আকর্ষণে।

আমাদের পণ্ডিতগণ দুঃখের কিছু কারণ উদ্ঘাটন করেছেন। তাহলো–

ঈর্ষী ঘৃণীত্যসন্তোষ্টো ক্রোধোনা নিত্য শংকিতঃ।
পর ভাগ্যোপজীবিচ ষড়েতে
দুঃখভাগিনঃ।

উপরোক্ত সবগুলো শব্দই দ্বিত্ব অর্থে ব্যবহার করা যায়। বাক্যে ব্যবহার করলেই কি অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে তা সুস্পষ্ট হয়। এগুলোর ব্যবহার ব্যক্তিচরিত্র ও ব্যষ্টিচরিত্র দু'স্থানেই হতে পারে। যেমন ধরুন ঈর্ষা শব্দটি কর্মে, শিক্ষায়, মানবতায়, সেবায় যদি অপরের সঙ্গে ঈর্ষাবশতঃ ঐসব কর্ম করি তাহলে নিজ এবং সমষ্টির কল্যাণ সাধিত হবে। কিন্তু সম্পদ আহরণ, প্রভাব প্রতিপত্তি, নিজ সুখ অন্বেষণ প্রভৃতি অর্জন করার জন্য অপরের সঙ্গে ঈর্ষাবশতঃ কাজ করি তাহলে ব্যক্তি ও সমষ্টির অকল্যাণ সাধিত হবে। এভাবে ঘৃণা, অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ এর এরূপ ব্যবহার হতে পারে। অল্পে তুষ্ট হলে সুখের আভাস পাওয়া যায় অসন্তুষ্টি দূর করার এও একটি উপায়। আমরা অল্পে তুষ্ট হই না বলে অসন্তুষ্টিতে ভুগি।

নিত্যশংকা জীবনকে দুর্বিষহ করে। অপরাধ-প্রবণতা ব্যক্তির নিত্যশংকার জন্ম দেয়। দেশের নৈরাজ্য ও কুশাসন সমষ্টির নিত্যশংকার সৃষ্টি করে। মৃত্যুভয় সকলের আছে। মায়াবশতঃ পার্থিব লোভে পড়ে আমরা মৃত্যুকে ভুলে থাকি কিন্তু শংকা ভুলে থাকার বিষয় নয়, সর্বদা পিছু পিছু হাঁটে। "জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে" মাইকেলের কবিতার এ সত্য জেনেও আমরা মরিতে চাই না। কবিগুরু তো মরণকে শ্যামের সঙ্গে তুলনা করেছেন– মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান। যুধিষ্ঠিরের মতে মরতে চাই না এটাই আশ্চর্য।

আর একটি দোষ দুঃখের কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন তা হলো, পরের ভাগ্যের উপর জীবিকা নির্বাহ। নিজে পরিশ্রম করে গ্রাসাচ্ছাদন যোগাড় করব এরূপ সংকল্পবদ্ধ মানুষের প্রয়োজন। যুধিষ্ঠিরের সুখী ব্যক্তির সংজ্ঞায় একটি কথা হলো স্বোপার্জিত অর্থে শাকান্ন ভোজন। স্বোপার্জিত বলতে নিজের পরিশ্রমলব্ধ অর্থ। এটি ব্যক্তি ও সমষ্টিতে প্রয়োগ হতে পারে। ব্যক্তিতে নিজের উন্নতি, সমষ্টিতে দেশের উন্নতি।

গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অপরের পরিশ্রমলব্ধ অর্থের সঞ্চয়কে চৌর্যাপরাধ হিসেবে অভিযুক্ত করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন– হে অর্জুন! যাদেরকে দিয়ে তুমি কাজ করিয়েছ তাদের পাওনা পরিশোধের পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাই

তুমি নিতে পার, তা না হলে তুমি চোর হবে। অপরের সম্পদ লুণ্ঠনকারী হিসাবে চিহ্নিত হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় বিপরীত দৃশ্য। উপার্জনের কোন মাত্রা নেই, বৈধ অবৈধ কোন পথ বন্ধ থাকে না উপার্জনের নেশায়। এ ছাড়া এ নেশা অপরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যে সঙ্কট সৃষ্টি করে তাতেই অশান্তি স্থায়ী বাসা বাঁধে। 'সম্পদে সঙ্কট আনে' একটি চিরন্তন বাণী। 'সমাজের বিভিন্ন অনিয়ম জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করে নিত্য শঙ্কায় জীবন চালাতে বাধ্য করে।' অথচ এ সঙ্কট মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্ত জীবন চালাবার চিন্তা আমাদের হয় না।

সম্পদে সঙ্কট আনে, খ্যাতিতে আনে বিড়ম্বনা।
অধিক সন্তানে দারিদ্র্য আনে, বুদ্ধি হীনে আনে বঞ্চনা।

স্বোপার্জিত অর্থ যেমন ব্যক্তিজীবনকে আনন্দিত করতে পারে সেরূপ সমষ্টি জীবনও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হতে পারে যদি রাষ্ট্রের সকল অধিবাসী দেশের জনসম্পদ আহরণকে অবশ্য করণীয় বিষয় মনে করে। উপরের শ্লোকে একটি কথা বলা হয়েছে "অপরের ভাগ্যের উপর জীবিকা নির্বাহ" এ কথাটি এককজীবন ও সমষ্টিজীবনে প্রয়োগ হতে পারে। কোন দেশ যদি নিজ সম্পদ সংগ্রহ না করে অপরের দেশের সম্পদের উপর রাষ্ট্র চালনার চিন্তা করে তা হলে রাষ্ট্রের দুঃখ কে ঘোচাবে?

তাই রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধ করতে হলেও নিজ সম্পদে আস্থা রেখে চলতে হবে। নতুবা ব্যক্তি জীবন ও সমষ্টিজীবন দুটোই দুঃখ ভারাক্রান্ত হবে। কষ্ট পেলেও নিজের অর্জিত অন্নই সুখ উৎপাদন করে।

পণ্ডিতজনের আর একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য–

ষড়দোষা পুরুষেনেহ
হাতব্যাভূতিমিচ্ছতা।
নিদ্রা তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধ আলস্য দীর্ঘসূত্রতা।

ছয়টি দোষ পুরুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর তা হলো–

অশান্তি স্থায়ী বাসা বাঁধে। নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা।

নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা। এগুলো সবই আমাদের আছে কিন্তু মাত্রা রেখে আমরা চলি না। এ প্রসঙ্গে ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর একটি কবিতা বিশেষ প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। কবিতাটির নাম–

"কমবেশি"

যত কম পার তত কম খাও। যত বেশি পার বাতাসে বেড়াও।

যত কম রাখ বসন ভূষণ। যত পার কর স্নানাবগাহন।

যত কম পার বৃথা চিন্তা রেখে। যত বেশি পার বিলাও অপরে।

যত পার কর নিদ্রার কর্তন। যত বেশি পার করহ ভজন ।

যত কম পার উপদেশ দিও। যত বেশি পার পালন করিও।

প্রতি কাজে মাত্রা ঠিক রাখা আমাদের কর্তব্য হওয়া উচিৎ। অধিক সুখ হয়তো আমরা পাব না কিন্তু দুঃখের মাত্রা তো কমাতে পারবো।

('শ্রী শিবশঙ্কর চক্রবর্তী' এর লেখা থেকে সংগৃহিত)

পুজোর আগমনী বার্তা

অসীম কুমার দাশ

দৃশ্য-১

পুজো শুরু হওয়ার আগেই বাংলার ঘরে ঘরে পড়ে যায় নতুন নতুন শাড়ি, জামা-কাপড়, ধুতি-পাঞ্জাবি কেনার হিড়িক। পুজোর বাজারের ভিড়ে একটি শোরুমে দেখা গেল একটি কচি গলার চিৎকার সব আওয়াজকে ছাপিয়ে গেল, 'পাপা কোথায়, পাপা?' ট্রায়াল রুম থেকে বেরিয়ে সবার আগে পাপাকে দেখানো চাই ছোট্ট মেয়েটির; পাপা বলবে, পোশাকটা তাকে কেমন মানিয়েছে। পাপা উদাস ভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, বোধহয় ভিড় তার পছন্দ নয়। অথবা শপিং-এর অবস্থা দেখে কুপোকাত গৃহকর্তাঃ মেয়েটি পাপার সামনে দুহাত ছড়িয়ে দাঁড়ায়, ভাবটা হল, 'দেখো তো আমায় কেমন লাগছে?' পাপার পছন্দ হলে তবেই পোশাকটা রাখা হবে। আমি মুগ্ধ হয়ে সেই দৃশ্য দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, আজ থেকে পনের-কুড়ি বছর পর দৃশ্যটা পাল্টে যাবে, তখন ট্রায়াল রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে মেয়েটির প্রেমিক কিংবা স্বামী, যাকে মেয়েটি বলবে, 'দেখো তো আমায় কেমন লাগছে?'

দৃশ্য-২

মহালয়ার ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেল আমার। টিভিটা অন করলেই হয়, কিন্তু ইচ্ছে করে না মোটেই। একা একা কি কোনো আনন্দকেই আনন্দ বলে মনে হয়?

ছেলে পড়ে আছে কোন দূর দেশে, আর আমি পড়ে আছি এখানে, একা এই বাড়িতে। বাইরে বাগানে গাছ ভরে শিউলি ফুল ফুটেছে। তারই গন্ধ নাকে এসে লাগছে।

মনটা যেন একলাফে অনেক অনেক বছর পেছনে চলে যায়। মনে পড়ে যায় বন্ধুদের সাথে হুড়োহুড়ি করে ফুল কুড়োনোর কথা।

এখনও নিশ্চয়ই শিউলি গাছের তলা ফুলে ফুলে সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু কুড়োনোর মানুষ নেই। সব হারিয়ে গেছে, কিচ্ছু আর ফিরে আসবে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অলস পায়ে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালাম।

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম নিচে তাকিয়ে।

গোলাপি ফ্রক পরা ছোট্ট একটা মেয়ে মুঠো ভর্তি করে ফুল কুড়োচ্ছে এই ভোরবেলায়।

চিৎকার করলাম, "কে রে ওখানে?"

মেয়েটা মুখ তুলে ফিক করে হেসে বলল, "আমি গো ঠাম্মা! তোমার ফুল লাগবে?" চিনতে পারলাম, পাশের বাড়ির মালতীর মেয়ে পিঙ্কিকে।

পিঙ্কির দেওয়া মুঠো ভর্তি শিউলি ফুল টেবিলে সাজিয়ে রাখতে রাখতেই ফোন টুং টাং আওয়াজ করে উঠলো।

তুলে নিয়ে দেখি ছেলে মেসেজ করেছে, "মা, মহালয়া কেমন শুনছ? নিশ্চয়ই খুব মন খারাপ তোমার? নাও এবার সব মন খারাপ দূরে সরিয়ে রেখে কোমর বেঁধে তৈরি হয়ে নাও। পুজোর পাঁচ দিন মা-ব্যাটায় অনেক ঘুরব। সরি, তোমাকে সারপ্রাইজ দেবো বলে আগে বলি নি। ষষ্ঠীর ভোরেই আমি আসছি!"

আছে, আছে! সব আছে! কিচ্ছু হারিয়ে যায় নি! ছুটে গিয়ে টিভিটা অন করলাম, সঙ্গে সঙ্গে ঘর মুখরিত হয়ে উঠলো সুরেলা আওয়াজে,

"বাজলো তোমার আলোর বেণু, মাতলো যে ভুবন

আজ প্রভাতে সে সুর শুনে খুলে দিনু মন।'

অন্তরে যা লুকিয়ে রাজে

অরুণবীণায় সে সুর বাজে-

এই আনন্দযজ্ঞে সবার মধুর আমন্ত্রণ।"

দৃশ্য-৩

টুকিটাকি কেনাকাটা সেরে রিক্সায় বাড়ি ফিরছি। দেখছি মহা সমারোহে গাড়িতে চাপিয়ে মাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মণ্ডপের উদ্দেশ্যে। দুহাত মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম মাকে। দেখি রিকশাওয়ালা রিকশা চালাতে চালাতেই শীর্ণ দুহাত কপালে ঠেকিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করল মাকে। চিরকালের বঞ্চিত জীবনেও মায়ের প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি। কিছুটা কৌতূহলে, কিছুটা মজা করে জিজ্ঞেস করলাম,

"কি চাইলে মায়ের কাছে?"

সে একগাল হেসে বলল, "চাইব আবার কি। মা যা দিয়েছেন, তার জন্যই ধন্যবাদ জানালাম মাকে।"

"কি দিয়েছেন মা তোমায়?" কিছুটা অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলাম।

"গেল বছর খুব খারাপ অবস্থা গেছে দাদা! একবেলা খেলে আরেকবেলা খেতে পাই না এমন দশা।

তখনই রিকশা চালানোর কাজটা পেলাম। বলতে নেই মায়ের দয়ায় এ বছরে অনেক রোজগার হচ্ছে আমার।" আবার একগাল হাসল সে।

আমি স্তব্ধ হয়ে ভাবছিলাম, কত পেয়েও আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি না।

আরও আরও চাই করে নিজেরও শান্তি নষ্ট করি, ঈশ্বরকেও শান্তিতে থাকতে দিই না। সেজন্যেই বলে অল্পে সন্তুষ্ট মানুষেরাই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী।

দৃশ্য-৪

বিশাল একটি নামকরা পুজো প্যান্ডেলে দাঁড়িয়ে আছি। ভিড়ের মধ্যেই প্রাণপণ

চেষ্টা করছি ছবি তোলার। সেই সময়েই ছেলে মেয়ে একদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল আমার। দেখি এক ভদ্রলোক ভিড়ের মধ্যেই ভিডিও কলিং এ ব্যস্ত। দেখে বিরক্ত হওয়ার আগেই শুনতে পেলাম ভদ্রলোক বলছেন, "এই দেখো বাবা প্রতিমা! এই দেখো প্যান্ডেলটা কেমন সাজিয়েছে!"

বুঝতে পারলাম বাড়িতে বসে থাকা বৃদ্ধ অশক্ত বাবাকে পুজোর আনন্দে সামিল করতে চাইছেন ভদ্রলোক। কারণ আমার চোখে পড়ে গেছে ওপ্রান্তে এক বৃদ্ধের হাসিমুখ।

ছেলের কথার মাঝখানেই ভক্তিভরে দুহাত মাথায় ঠেকালেন বৃদ্ধ।

আমি আমার ছেলে মেয়ের মুগ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম পুরো ব্যাপারটায় যে এক আশ্চর্য ভালোবাসা জড়িয়ে আছে, সেটা ওদের দুজনকেই স্পর্শ করেছে।

মায়ের হাসিমুখটার দিকে তাকিয়ে তখন আমি মনে মনে বলছিলাম, এরকম আশ্চর্য ভালোবাসার দৃশ্য দেখতেই কি প্রতিবছর স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নেমে আসতে হয় মা তোমাকে?

পুজোর আনন্দে ভরে উঠুক সবার জীবন। পুজো আসছে কদিন বাদেই। খুব খুব ভালো থেকো সবাই। অনেক আনন্দ করো পুজোতে।

সূত্র : ইন্টারনেট

দুর্গা পুজোর ইতিবৃত্ত

অসীম কুমার দাশ

কথায় আছে, "বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বন", সত্যিই প্রায় সারাবছর জুড়েই বাঙালির জীবন নানা প্রকার উৎসবের আলোয় মুখরিত হয়ে থাকে। তার মধ্যে অন্যতম হলো দুর্গাপূজা। শিশির সিক্ত দূর্বা ঘাদসে ঝড়ে পড়া শিউলি ফুলের গন্ধ আর তুলোর মতো কাশফুলের দোলা বাংলার মাঠঘাট এক বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটে মহালয়ার শুভ বন্দনাতে। ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে মিলন উৎসব হলো এই দুর্গাপুজো।

সনাতনী সম্প্রদ্রায়ের সবচেয়ে বড়ো ধর্মীয় উৎসব ও মিলনমেলা এই পুজো। ধর্মীয় আচার-আচরণ, রীতি-নীতির পাশাপাশি সকলে মেতে উঠেন আনন্দের জোয়ারে। দেবী দর্শনে মন্দির থেকে মন্দিরে ছুটে চলা। সব জায়গায় তৈরি হয় আনন্দের আবহ ও কোলাহল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্যুভেনিরে প্রকাশসহ বিভিন্নমুখী কর্মসুচী নিয়ে ব্যস্ত থাকে পাড়া, গ্রাম ও সমগ্র মহল্লাবাসী।

হিন্দু পুরানে কতিথ আছে, পুরাকালে মহারাজ সুরথ তাঁর রাজ্য হারিয়ে ফেলেন, সেই হারানো রাজ্য ফিরে পেতে তিনি বসন্তকালে মা দূর্গার পুজো করেছিলেন। এই কারনে দুর্গাপূজাকে বাসন্তী পূজা নামেও অভিহিত করা হয়।

মুলতঃ বছরে দুই বার দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। একটি বসন্তকালে বাসন্তী পূজা নামে অন্যটি শরৎকালে শারদীয় দুর্গাপূজা নামে। তবে শারদীয় অর্থাৎ শরৎকালীন দুর্গাপূজাই বাঙালির ঘরে বেশ ঝাঁকজমক ও সাড়ম্বরে আয়োজিত হয়ে থাকে।

সাধারণত ফাল্গুন চৈত্র মাসে বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্র মাসের নবরাত্রির গননাকাল থেকে রামনবমীর দিন পর্যন্ত বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

অন্যদিকে আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠ থেকে দশম দিন পর্যন্ত দুর্গাপূজার এই পাঁচ দিনকে যথাক্রমে দুর্গাষষ্ঠী, দুর্গাসপ্তমী, মহাঅষ্টমী, মহানবমী এবং বিজয়া দশমী বলা হয়।

মা দুর্গার পূজা শুরু হওয়ার এক সপ্তাহ পূর্বেই আমবস্যার দিন পালিত হয় মহালয়া। মহালয়ার ভোর বেলায় আমরা শুনতে পাই চন্ডি পাঠ।

এর পরের সপ্তাহ থেকেই শুরু হয় বোধন, দুর্গাষষ্ঠী, দুর্গাসপ্তমী, মহাঅষ্টমী, মহানবমী এবং বিজয়া দশমীর সিঁদুর খেলা ও মায়ের বিসর্জনের মাধ্যমে সমাপ্ত হয় শারদীয় দুর্গোৎসব।

সূত্র : ইন্টারনেট

শারদীয় শুভেচ্ছা

SQUARE TEXTILE

54 Darus Salam, Mirpur, Dhaka-1216, Bangladesh

সিএফসি পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে
শুভ শারদীয় দুর্গোৎসবের
আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

CFC

real taste and best.....

সিএফসি

ক্যালিফোর্নিয়া ফ্রাইড চিকেন এন্ড পেস্ট্রি শপ(সিএফসি)

প্রধান শাখা (ধানমন্ডি-২৭) : ০১৯৯২০৪৩৯১৮/০১৯৯২০৪৩৯১৯
গুলশান-২ : ০১৯৯২০৪৩৯২৪/০১৯৯২০৪৩৯৩৫
নিকেতন : ০১৯৯২০৪৩৯২৬/০১৯৯২০৪৩৯৩৬
মিরপুর : ০১৯৯২০৪৩৯২০/০১৯৯২০৪৩৯৩১
শাহবাগ : ০১৯৯২০৪৩৯২২/০১৯৯২০৪৩৯৩৩

সবাইকে শারদীয় দুর্গোৎসবের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

RF Reach Fibre Ltd.

We love to hear any inquiry from you. Call us +88 01713082166, +88 01612735000
or email us info@reachbds.com , sahapbr@gmail.com

ইউনিওয়াশ এর পক্ষ থেকে শারদীয় দুর্গাপূজার
শুভেচ্ছা
SHINE FORMULA + STAIN CLEANER
uni wash
সিনথেটিক ডিটারজেন্ট পাউডার
ইউনিওয়াশ
ডিটারজেন্ট পাউডার
RSPL
EVOLUTION IS CONSTANT

"অপরাজিতা"-র বিগত সংখ্যার প্রচ্ছদসমূহ

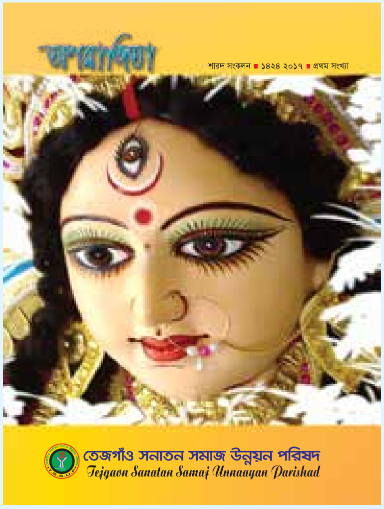

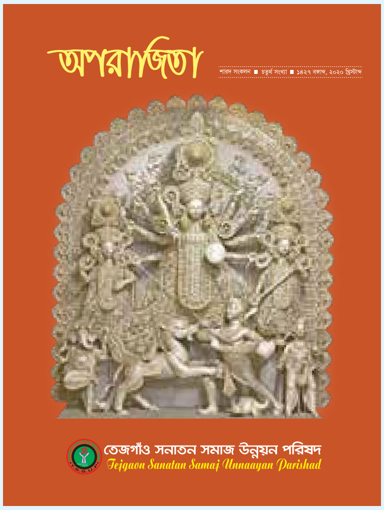

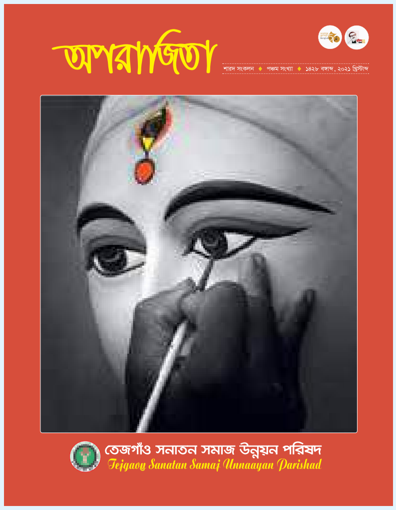

হিন্দুধর্মের ইতিহাস

ড. নিখিল চন্দ্র সরকার

ভারতীয় উপমহাদেশের একাধিক স্থানীয় ধর্মমত একত্রে হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে, লৌহযুগ থেকে ঘটতে থাকা ভারতের ধর্মবিশ্বাসের নানা বিবর্তন এই ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই মতের উৎস আবার ব্রোঞ্জযুগীয় সিন্ধু সভ্যতা ও তৎপরবর্তী লৌহযুগীয় বৈদিক ধর্ম। এজন্য এই ধর্মকে বিশ্বের একটি "প্রাচীনতম ধর্ম" বলা হয়। পণ্ডিতরা হিন্দুধর্মকে বিভিন্ন উৎস থেকে উদ্ভূত ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ হিসেবে মনে করেন, যার একক প্রতিষ্ঠাতা নেই।

হিন্দু দর্শনে ঈশ্বর বা ব্রহ্মের বাচক

এই হিন্দু সংমিশ্রণ বৈদিক যুগের পরে ৫০০-২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এবং ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে, দ্বিতীয় নগরায়নের সময়কালে এবং হিন্দুধর্মের ধ্রুপদী যুগের শুরুর দিকে আবির্ভূত হয়, যখন মহাকাব্য এবং প্রথম পুরাণ রচিত হয়েছিল।

হিন্দুধর্মের ইতিহাসকে সচরাচর এর ক্রমবিকাশের যুগে ভাগ করা হয়। প্রথম পর্যায়টি প্রাক-বৈদিক যুগ হিসেবে গণ্য করা হয়, যার শেষ ১৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে। এর মধ্যে সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা এবং স্থানীয় প্রাক-ঐতিহাসিক ধর্মগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ১৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে ইন্দো-আর্য অভিবাসনের সাথে ঐতিহাসিক বৈদিক ধর্মের প্রবর্তন শুরু হয় এবং উত্তর ভারতে বৈদিক যুগের সূচনা হয়।

খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর পর ধীরে ধীরে ভারতে বৌদ্ধধর্মের পতন ঘটলে বৈদিক ধর্মের নবজাগরণের রূপে ধ্রুপদি হিন্দুধর্মের উত্থান ঘটে। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত- হিন্দু দর্শনের এই ছয়টি প্রধান শাখার উদ্ভব ঘটে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে। এই সময়টি হিন্দুধর্মের "স্বর্ণযুগ" বলে পরিচিত যা গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমসাময়ীক। প্রায় একই সময়ে ভক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে উদ্ভব ঘটে শৈবধর্ম ও বৈষ্ণবধর্মের মতো একেশ্বরবাদী মতবাদগুলির।

মোটামুটিভাবে ৬৫০ থেকে ১১০০ খ্রিস্টাব্দের পর ধ্রুপদী পৌরাণিক হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠালাভ করে মধ্যযুগে। আদি শংকরের অদ্বৈত বেদান্ত মতবাদও এই সময় প্রচারিত হয়। উক্ত মতবাদ বৈষ্ণব ও শৈব মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এবং স্মার্তধর্মের উত্থান ঘটায়। এর ফলে দর্শনের অবৈদান্তিক শাখাগুলির অবলুপ্তি ঘটে।

হিন্দু শব্দের নামোৎপত্তি

ঐতিহ্যগতভাবে হিন্দু ধর্ম; Sanatan Dharm বা চিরস্থায়ী ধর্ম এবং Arya Dharm বা সুগুণাবলির ধর্ম নামে সুপরিচিত ছিল। হিন্দু শব্দটি ফার্সী Hindoostan হিন্দোস্তান নামের সাথে সম্পর্কিত। হিন্দোস্তান শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে হিন্দের স্থান বা ভূমি। ঐতিহাসিকদের মতে, হিন্দু শব্দটি সিন্ধু শব্দের পরিবর্তিত রূপ। ১২তম শতাব্দীতে ফার্সী ভাষী তুর্কি আক্রমণ ও তদক্রম শাসন ব্যবস্থায় হিন্দোস্তান নামটির প্রসার ঘটে। বৃটিশ কলোনিয়াল সরকারের সময় Hinduism বা হিন্দুধর্ম নামে একটি একক ধর্মীয় পরিচয়ের বিস্তৃতি ঘটে।

হিন্দুধর্মের ভিত্তিমূল

পৌরাণিক কালপঞ্জি থেকে যদিও হাজার হাজার বছরের একটি বংশবৃত্তান্ত পাওয়া যায়, পণ্ডিতগণ হিন্দুধর্মকে বিভিন্ন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ বা সংশ্লেষণ হিসেবে বিবেচনা করেন। ঐতিহাসিক বৈদিক ধর্ম রয়েছে এর মূলে, যা ইতিমধ্যেই "ইন্দো-আর্য এবং হরপ্পা সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটি সংমিশ্রণ"-এর ফসল, এবং তা উত্তর ভারতে লৌহ যুগের কুরু রাজ্যের ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং মতাদর্শে বিকশিত হয়েছিল; কিন্তু উত্তর-পূর্ব ভারতের শ্রমণ বা ত্যাগী ঐতিহ্য এবং মেসোলিথিক এবং ভারতের নব্যপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতি, যেমন সিন্ধু সভ্যতার ধর্ম, দ্রাবিড় ঐতিহ্য, এবং স্থানীয় ঐতিহ্য এবং উপজাতীয় ধর্ম।

এই হিন্দু সংমিশ্রণ বৈদিক যুগের পরে, ৫০০-২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এবং ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে, দ্বিতীয় নগরায়নের সময়কালে এবং হিন্দুধর্মের ধ্রুপদী যুগের শুরুর দিকে আবির্ভূত হয়, যখন মহাকাব্য এবং প্রথম পুরাণ রচিত হয়েছিল। এই ব্রাহ্মণ্যবাদী সংমিশ্রণ, স্মৃতি সাহিত্যের মাধ্যমে শ্রামণিক ও বৌদ্ধ প্রভাব এবং উদীয়মান ভক্তিবাদী ঐতিহ্যকে ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উন্নতির প্রভাবে এই সংমিশ্রণের উদ্ভব ঘটে। গুপ্ত শাসনামলে প্রথম পুরাণ রচিত হয়েছিল, যা "প্রাক-শিক্ষিত ও উপজাতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে মূলধারার ধর্মীয় মতাদর্শ প্রচার করতে ব্যবহৃত হয়েছিল।" ফলস্বরূপ পুরাণিক হিন্দুধর্ম, ধর্মশাস্ত্রের পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণ্যবাদ

এবং স্মৃতিগুলির থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা ছিল। বৌদ্ধধর্মের সাথে হিন্দুধর্ম বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে সহাবস্থানের ফলে অষ্টম শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম সমস্ত স্তরে উচ্চতর অবস্থান লাভ করে।

তৎকালীন সময়ের শাসকশ্রেণি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি গ্রহণের ফলে উত্তর ভারত থেকে এই "হিন্দু সংমিশ্রণ", এবং এর সামাজিক বিভাজন দক্ষিণ ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু অংশে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় শাসকের দ্বারা প্রদত্ত জমিতে ব্রাহ্মণদের বসতি স্থাপনের মাধ্যমে সুপরিচিত অ-বৈদিক দেবতাদের অন্তর্ভুক্তি এবং আত্তীকরণ ও সংস্কৃতীকরণের প্রক্রিয়াতে সহায়তা করা হয়, যার ফলে "উপমহাদেশ জুড়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেছে"। সংস্কৃতির এই আত্মীকরণ প্রক্রিয়াটি ভারতের স্থানীয় ঐতিহ্যের বিস্তৃত বৈচিত্র্যকে "ধারণাগত অখণ্ডতার জীর্ণ বস্ত্রে অর্ধ আবৃত" হিসেবে ব্যাখ্যা করে।

এলিয়ট ডয়েচের মতে, ব্রাহ্মণরা এই সংমিশ্রণের বিকাশে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেছিল। তারা দ্বিভাষিক এবং দ্বি-সাংস্কৃতিক ছিল, তাদের আঞ্চলিক ভাষা এবং প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ভাষা উভয়ই কথা বলত, যা সংস্কৃতি এবং ভাষার মধ্যে আঞ্চলিক পার্থক্য অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল। তারা গ্রাম্য সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে মূলধারার সংস্কৃতি এবং মূলধারার সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে গ্রাম্য সংস্কৃতি রূপান্তর করতে সক্ষম ছিল, যার ফলে স্থানীয় সংস্কৃতিটি একটি বৃহত্তর সংস্কৃতির সাথে মিশে যাওয়ার সুযোগ হয়। বৈদিক এবং অল্প পরিমাণে স্মার্তরা ঐতিহ্যবাহী বৈদিক শিক্ষায় আস্থার কারণে একটি নতুন ব্রাহ্মণ্যবাদের উদ্ভব হয়, যা লৌকিক ও আঞ্চলিক দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তুতি রচনা করে এবং স্থানীয় ঐতিহ্যের ধারক হয়ে ওঠে।

উৎপত্তি

হিন্দুধর্ম কবে, কোথায়, কার হাতে প্রথম উৎপত্তি হয়েছিলো তার সঠিক ইতিহাস জানা যায় না। তবে এ ধর্মের উৎপত্তি স্থল এশিয়ার মাইনর অর্থাৎ আজকের তুরস্ক, ইরান, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, জর্জিয়া, রাশিয়ার অংশ বিশেষ, কাজাকিস্তান এই অঞ্চলের কোন এক স্থানে আর্য জাতির মাধ্যমে খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ থেকে ৩০০০ সালের মধ্যে এ ধর্মের উৎপত্তি হয় বলে মনে করা হয়। তবে হিন্দু ধর্মের উৎপত্তির নিয়ে ঐতিহাসিকরা একমতে পৌছাতে ব্যর্থ হয়েছেন। তবে বড় অংশই এশিয়া মাইনরে আর্য জাতির মাধ্যমে এ ধর্মের উৎপত্তি বলে মত দিয়েছেন। তবে উৎপত্তি যেখানেই হোক আজকের হিন্দু ধর্মের বিকাশ অর্থাৎ পূর্ণতা এসেছে ভারতের মাটিতে এ বিষয়ে সবাই একমত। আর উৎপত্তির সময় এ ধর্মের নাম হিন্দু ছিলো না বরং বৈদিক বা সনাতন নামেই এ ধর্মের উৎপত্তি হয়। কালক্রমে সিন্ধু নদীর তীরে স্থায়ী ঘাটি গড়ায় এ ধর্মের নাম ক্রমে হিন্দুধর্ম হয়ে যায়।

ভারতে আগমণ

ইতিহাসবিদদের মতে আর্যরা এশিয়া মাইনর থেকে প্রথমে ইরান (পারস্য) এবং পরে খ্রিস্টপূর্ব ১৫শ থেকে ২ হাজার সালের কাছাকাছি সময়ে ভারতে প্রবেশ করে। মূলত এই আর্য জাতিরাই হিন্দুধর্মের পূর্ব পুরুষ বলে অধিকাংশ ইতিহাসবিদ মত প্রকাশ করেছেন। তারা আসার সময় সঙ্গে করে বেদ নামক একটি ধর্মগ্রন্থ সঙ্গে আনেন। এ ধর্মগ্রন্থকে ঐশ্বরিক (যা ঈশ্বর কর্তৃক নাজিল হয়েছে) বলে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস। হাজার হাজার বছর পূর্বের হলেও এ গ্রন্থে এমন সব উপমা এবং শ্লোক রয়েছে যা ওই সময়ের মানুষের দ্বারা লেখা বা আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। এ কারণে এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থকে ঐশ্বরিক বলে বিশ্বাস করা হয়। বেদ নামক ধর্মগ্রন্থের কারণে আর্য জাতিকে বৈদিক জাতি এবং হিন্দু ধর্মকে বৈদিক ধর্মও বলা হয়।

তবে আধুনিক ইতিহাসবিদদের মতে, আর্য জাতি ভারতে প্রবেশ করার পর এখানকার ভূমিপুত্র দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক, কোল, মুন্ডাসহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সংস্পর্ষে আসে। বিশেষ করে আর্য পুরুষরা নারী সঙ্গীর অভাবে অনার্য নারীদের সঙ্গে একত্রে বসবাস শুরু করার কারণে আর্যদের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়। আর এ কারণে এখন ভারত বা এর কাছাকাছি অঞ্চলে বসবাস করাদেরকে মিশ্র জাতির মানুষ বলে বর্ণনা করা হয়। খ্রিস্টপূর্ব ২ হাজার সালের দিকে আর্যরা প্রথম উত্তর ভারত দিয়ে প্রবেশ শুরু করে। কালক্রমে তারা দক্ষিণ, উত্তর পূর্ব ভারত এমনকি থাইল্যান্ড, মালেশিয়া, ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ, উত্তর পূর্ব ভারত এমনকি থাইল্যান্ড, মালেশিয়া, ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত পৌছাতে আর্যদের সময় লাগে পঞ্চম খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। অর্থাৎ উত্তর ভারত থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত পৌছাতে আর্যদের আড়াই হাজার বছর সময় লেগেছে বলে মনে করা হয়। আর এই আর্যদের সঙ্গে হিন্দু ধর্মও এই আড়াই হাজার বছরে উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারত, উত্তর পূর্ব ভারত, থাইল্যান্ড, মালেশিয়া, ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

তবে সব সময় যে আর্য জাতির মাধ্যমে হিন্দু ধর্ম বিস্তৃত হয়েছে এমনটা নয়। আর্য থেকে ক্রমে যে মিশ্র জাতির উদ্ভব হয়েছে এমনকি অনার্যরাও হিন্দু ধর্মে

দিক্ষিত হয়ে পরে তারাও এ ধর্মের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছে। অর্থাৎ আর্যদের মাধ্যমে যার সূচনা হয়েছিলো তা ক্রমে স্থানীয়দের ধর্ম হয়ে ওঠে এবং স্থানীয়দের পরে তার প্রসারে কাজ করেন।

এছাড়া আর্যদের ভারতে প্রথম আগমণের সময় খ্রিস্টপূর্ব ১৫শ থেকে ২ হাজার সালে সেটি আরো নিশ্চিত হওয়া যায় সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংস থেকে। ব্রোঞ্জ যুগের দ্রাবিড় জাতির এক অনন্য সৃষ্টি ছিলো এই সিন্ধু সভ্যতা। এ সভ্যতা ধ্বংস হয় খ্রিষ্টপূর্ব ১৫শ থেকে ২ হাজার সালের কাছাকাছি সময়ে বলে ইতিহাসবিদরা নিশ্চিত হয়েছেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত সিদ্ধু সভ্যতার শুন্যস্থান পূরণে অন্য কোন জাতির সন্ধান না পাওয়ার কারণেও মনে করা হয় দ্রাবিড়দের শুন্যস্থান পূরণ করেছে তৎকালিন আর্যরা।

সাধারণত একটি সভ্যতার বিলুপ্তির পর সেখানে নতুন যে সভ্যতা গড়ে ওঠে সেই নতুন সভ্যতায় পুরাতন সভ্যতার অনেক ছাপ থাকে। সিন্ধু সভ্যতার অনেক কিছুই আর্য তথা হিন্দু ধর্মে প্রবেশ করে। যার অনেক কিছু এখনো বিদ্যমান। এটিও নির্দেশ করে যে খ্রিস্টপূর্ব ১৫শ থেকে ২ হাজার সালের দিকেই আর্য জাতি তথা হিন্দু ধর্ম ভারতের মাটিতে প্রথম প্রবেশ করে।

বেদ হল প্রাচীন ভারতে লিপিবদ্ধ একাধিক গ্রন্থের একটি বৃহৎ সংকলন। ছান্দস্‌ ভাষায় রচিত বেদই ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন এবং সনাতন ধর্মের সর্বপ্রাচীন পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। বৈদিক ঋষিরা মৌখিক প্রথার শিষ্যদের বেদ শিক্ষা দিতেন বলে একে শ্রুতি বলা হয়। পাশ্চাত্যের অনেক গবেষক ভাষাগত রচনাশৈলি, প্রত্নতাত্তিক প্রমাণাদির উপর নির্ভর করে বেদের রচনাকাল ১৫০০ থেকে ৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ হিসাবে ধারণা করেন।

বেদে মোট মন্ত্র সংখ্যা ২০৩৭৯টি। বেদের সংখ্যা চার: ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। এদের মধ্যে ঋগ্‌বেদ হচ্ছে সর্বপ্রাচীন। প্রত্যেকটি বেদ আবার চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত: সংহিতা (মন্ত্র ও আশীর্বচন), ব্রাহ্মণ (ধর্মীয় আচার, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও যজ্ঞাদির উপর টীকা), আরণ্যক (ধর্মীয় আচার, ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম, যজ্ঞ ও প্রতীকী যজ্ঞ) ও উপনিষদ্ (ধ্যান, দর্শন ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সংক্রান্ত আলোচনা)।

মহাজাগতিক ধারা

উপনিষদ

উপনিষদ (সংস্কৃত: **উপনষিদ্**) হিন্দুধর্মের এক বিশেষ ধরনের ধর্মগ্রন্থের সমষ্টি। এই বইগুলিতে হিন্দুধর্মের তাত্ত্বিক ভিত্তিটি আলোচিত হয়েছে। উপনিষদের অপর নাম বেদান্ত। ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, উপনিষদ্‌গুলিতে সর্বোচ্চ সত্য স্রষ্টা বা ব্রহ্মের প্রকৃতি এবং মানুষের মোক্ষ বা আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভের উপায় বর্ণিত হয়েছে। উপনিষদ্‌গুলি মূলত বেদ-পরবর্তী ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক অংশের শেষ অংশে পাওয়া যায়। এগুলি প্রাচীনকালে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ছিল।

উপনিষদ্ সাধারণভাবে "বেদান্ত" নামে অভিহিত হয়ে থাকে। এই শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যাত হয় "বেদের শেষ অধ্যায়সমূহ বা শেষাংশ" হিসেবে। আবার বিকল্প একটি অর্থও করা হয়ে থাকে। সেটি হল "বেদের বিধেয় বা সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য" এছাড়া উপনিষদ সংখ্যা হল ১০৮টি তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপনিষদ ১২টি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঐতরেয়, কঠ, কেন, ছান্দোগ্য, ঈশ, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর, তৈত্তিরীয়, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য উপনিষদ। ব্রহ্ম (পরম সত্য) ও আত্মা (ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সত্ত্বা) উপনিষদের মূল উপজীব্য বিষয় এবং "তুমিই যে সেই আত্মা, তা জানা"ই হল গ্রন্থাবলির মূল বক্তব্য। ভগবদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের সঙ্গে মুখ্য উপনিষদ্‌গুলি (এই তিন শাস্ত্র একত্রে প্রস্থানত্রয়ী নামে পরিচিত) পরবর্তীকালের একাধিক বৈদান্তিক দার্শনিক গোষ্ঠীর ভিত্তি স্থাপন করে। এগুলির মধ্যে হিন্দুধর্মের দু'টি প্রভাবশালী অদ্বয়বাদী ধারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঐতিহাসিকদের মতে, মুখ্য উপনিষদ্‌গুলি প্রাক্-বৌদ্ধ যুগ থেকে শুরু করে খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়কালের বিভিন্ন পর্বে রচিত হয়। অপর দিকে অপ্রধান উপনিষদগুলি মধ্যযুগ ও প্রাক্-আধুনিক যুগের রচনা। অবশ্য প্রতিটি উপনিষদের সঠিক রচনাকাল নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। ব্রিটিশ কবি মার্টিন সেমোর-স্মিথ উপনিষদ্‌গুলিকে "সর্বকালের ১০০টি সবচেয়ে প্রভাবশালী বই"-এর তালিকাভুক্ত করেছেন। আর্থার শোপেনহাওয়ার, রালফ ওয়াল্ডো এমারসন ও হেনরি ডেভিড থোরো সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপনিষদ্‌গুলির গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। গবেষকেরা উপনিষদের দর্শনের সঙ্গে প্লেটো ও কান্টের দর্শনের মিল খুঁজে পান।

আধুনিক হিন্দু ধর্ম (১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের পরে)

হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ, যা বাংলার নবজাগরণ হিসেবেও পরিচিত, এটি বলতে বোঝায় ব্রিটিশ রাজত্বের সময় অবিভক্ত ভারতের বাংলা অঞ্চলে উনবিংশ ও বিংশ শতকে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের জোয়ার ও বহু কৃতি মনীষীর আবির্ভাবকে। মূলত রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭৫-

১৮৩৩) সময় এই নবজাগরণের শুরু এবং এর শেষ ধরা হয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১–১৯৪১) সময়ে, যদিও এর পরেও বহু জ্ঞানীগুণী মানুষ এই সৃজনশীলতা ও শিক্ষাদীক্ষার জোয়ারের বিভিন্ন ধারার ধারক ও বাহক হিসাবে পরিচিত হয়েছেন। উনবিংশ শতকের বাংলা ছিল সমাজ সংস্কার, ধর্মীয় দর্শনচিন্তা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, দেশপ্রেম ও বিজ্ঞানের পথিকৃৎদের এক অনন্য সমাহার যা মধ্যযুগের অন্ত ঘটিয়ে এদেশে আধুনিক যুগের সূচনা করে।

স্বামী বিবেকানন্দ Shami Bibekanondo; ১২ জানুয়ারি ১৮৬৩–৪ (জুলাই ১৯০২) নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন একজন হিন্দু সন্ন্যাসী, দার্শনিক, লেখক, সংগীতজ্ঞ এবং উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদী রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রধান শিষ্য। তার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে হিন্দুধর্ম তথা ভারতীয় বেদান্ত ও যোগ দর্শনের প্রচারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। অনেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক স্থাপন এবং হিন্দুধর্মকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান ধর্ম হিসেবে প্রচার করার কৃতিত্ব বিবেকানন্দকে দিয়ে থাকেন। ভারতে হিন্দু পুনর্জাগরণের তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। সেই সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণাটি প্রবর্তন করেন। বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তার সবচেয়ে বিখ্যাত বক্তৃতাটি হল, "আমেরিকার ভাই ও বোনেরা...," ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোয় বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় প্রদত্ত চিকাগো বক্তৃতা, যার মাধ্যমেই তিনি পাশ্চাত্য সমাজে প্রথম হিন্দুধর্ম প্রচার করেন।

ফ্রিডরিখ মাক্স মুলার (জার্মান: Friedrich Max Müller) (জন্ম: ৬ই ডিসেম্বর, ১৮২৩ – মৃত্যু: ২৮শে অক্টোবর, ১৯০০) ছিলেন বিখ্যাত ভারতবিশারদ, দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, অধ্যাপক, সংস্কৃত ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত ও অনুবাদক। রুশ দার্শনিক আফ্রিকান আলেকসান্দ্রোভিচ স্পিরের ডেংকেন উন্ট ভির্কলিশকাইট ("চিন্তা ও বাস্তবতা") শিরোনামের লেখা তাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল।

শ্রী অরবিন্দ বা অরবিন্দ ঘোষ (১৫ আগস্ট ১৮৭২ – ৫ ডিসেম্বর ১৯৫০) ভারতীয় বাঙালি রাজনৈতিক নেতা, আধ্যাত্মসাধক এবং দার্শনিক। তার পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ এবং মাতামহ রাজনারায়ণ বসু। অরবিন্দ ঘোষ বাল্যকালে ইংল্যান্ডে লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে গমন করেন এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হতে ট্রাইপস পাস করেন। দেশে ফিরে এসে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার অনুজ বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে বিপ্লবী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি কংগ্রেসের চরমপন্থী গ্রুপের নেতৃত্বে থাকাকালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে (১৯০৫ – ১৯১১) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তামিল (৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮–১৭ই এপ্রিল, ১৯৭৫) স্বাধীন ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি এবং দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ছিলেন। তার দ্বিতীয় গ্রন্থ 'The Reign of Religion in Contemporary Philosophy' প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে।

Heartiest wishes in the event of Durga Puja

With the best compliments from

mainstream
SHIPPING & LOGISTICS LTD.

International Freight Forwarder & Logistics Service provider

www.mainstream-bd.com

Corporate Office: House # 288 (3rd Floor), Road # 19/C, New DOHS, Mohakhali
Dhaka-1206, Bangladesh, Tel: +880 2 9859526, 8711714, Fax: +880 2 8711715

Branch Office: 11, Sk. Mujib Road, Chaity Plaza (4th Fl.), Agrabad C/A, Chittagong, Bangladesh
Email: keshab@mainstream-bd.com

Registered Office: 49, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh

Heartiest wishes in the event of Durga Puja

With the best compliments from

Bushra
international

Bushrainternational

Importer and Govt. Supplier

www.bushraintl.com

Corporate Office: House # 288 (2nd Floor), Road # 19/C, New DOHS, Mohakhali
Dhaka-1206, Bangladesh, Tel: +880 2 9859526, 8711714, Fax: +880 2 8711715
E-mail: info@bushraintl.com

Registered Office: 49, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh

www.runnerbd.com
ISO 9001 | 14001 | 45001
শারদীয় শুভেচ্ছা
BRANDS OF
RUNNER®
RUNNER motorcycles
RUNNER motorcycles
KTM
Vespa
aprilia
YADEA
BAJAJ
EICHER
Pioneer Motorcycle Manufacturer and exporter having 100,000+ capacity per year in Bangladesh
First ever Three-Wheeler Manufacturing Plant in Bangladesh having 30,000+ Capacity per year
Started Assembly for commercial vehicles for the local Market
Network Point 806
Happy Customer 470,000+

পছন্দ ও প্রয়োজন অনুযায়ী বেছে নিন যেমনটা আপনার চাই
আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ধারাবাহিকতায়
এক্সিম ব্যাংকের
আকর্ষণীয় আমানত হিসাবসমূহ
মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্বফ আমানত
' ইহলৌকিক শান্তি-পারলৌকিক মুক্তি'
মুদারাবা হজ্জ আমানত প্রকল্প
'আপনার হজ্জ হোক স্বাচ্ছন্দ্যময়'
এক্সিম রুহামা
'তিন বছরে দ্বিগুণ'*
এক্সিম যিয়াদাহ
'পাঁচ বছরে তিনগুণ'*
শর্ত প্রযোজ্য
এক্সিম শেফা
'প্রয়োজনের মুহূর্তে নিরাপত্তার আশ্বাস'
• মুদারাবা শেফা মাসিক সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প
মুদারাবা মাসিক আয় আমানত প্রকল্প
'প্রতি মাসের মুনাফা যখন উপার্জনের সাথী'
মুদারাবা সুপার সেভিংস আমানত প্রকল্প
'দ্বিগুণ লাভে সমৃদ্ধ আগামীর পথে'
মুদারাবা কোটিপতি আমানত প্রকল্প
'সঞ্চয়ে গাঁথা সুদিনের স্বপ্ন'
মুদারাবা এক্সিম স্টুডেন্ট সেভারস
'আজকের সঞ্চয়, আগামীর আত্মবিশ্বাস'
• মুদারাবা স্টুডেন্ট সঞ্চয়ী আমানত হিসাব
• মুদারাবা মাসিক স্টুডেন্ট সঞ্চয়ী প্রকল্প
মুদারাবা দেনমোহর/ বিবাহ আমানত প্রকল্প
'আর তোমরা স্ত্রীগণকে তাদের দেনমোহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও'
সুরা নিসা, আয়াত ২৫
আল ওয়াদিয়াহ চলতি আমানত
'আমানত থাকুক সুরক্ষিত'
মুদারাবা মেয়াদী আমানত
'মেয়াদ শেষ তো মুনাফা শুরু'
এক্সিম স্বপ্ন
'এগিয়ে যান স্বপ্নপূরণের পথে'
• মুদারাবা হাউজিং / অন্ট্রাপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প
এক্সিম সিনিয়র
'আমার সঞ্চয়, আমার অবলম্বন'
• মুদারাবা সিনিয়র মাসিক মুনাফা প্রকল্প
• মুদারাবা সিনিয়র মাসিক সঞ্চয়ী প্রকল্প
মুদারাবা সঞ্চয়ী আমানত
'সঞ্চয়ের শুরু এখানেই'
মুদারাবা মাসিক সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প
'মাসিক সঞ্চয়ে বার্ষিক মুনাফা'
এক্সিম কৃষি
'সঞ্চয়ের বীজে বাড়ুক সমৃদ্ধির ফসল'
• মুদারাবা কৃষি মাসিক সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প
EXIM BANK
এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড
শরীয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক
**এক্সিম ব্যাংকের সকল হিসাব শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত হওয়ায় মুনাফার হার কম/বেশি হতে পারে
www.eximbankbd.com
সবধরনের ব্যাংকিং তথ্যের জন্য 16246

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আলোকচিত্র

CAT
CATERPILLAR
আফজাল কনস্ট্রাকশন

বর্ষবরণ
১৪৩০ বঙ্গাব্দ
শুক্রবার

শারদীয় দুর্গোৎসব-২০২২

শারদীয় দূর্গোৎসব-
প্রধান অতিথি ঃ শ্রী সুজিত রায় নন্দী,
বিশেষ অতিথি ঃ জনাব শামীম হাসান,

শুভ জন্মাষ্টমী মহোৎসব-২০২৩
মঙ্গল শোভাযাত্রা

ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়
শুভ জন্মাষ্টমী মহোৎসব
পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী
মঙ্গল
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন
দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি
রাজ ভোজন

JMI GROUP

... your trusted partner in health & service sector

Subsidiaries & Joint Ventures

- JMI Syringes & Medical Devices Ltd.
- JMI Hospital Requisite Mfg. Ltd.
- JMI Marketing Limited
- JMI Vaccine Ltd.
- JMI Printing & Packaging Ltd.
- JMI Builders & Construction Ltd.
- JMI Export Import Co. Ltd.
- JMI Engineering Ltd.
- JMI Industrial Research & Toxicology Ltd.
- JMI Industrial Gas Ltd.
- JMI LPG Petroleum Ltd.
- JMI Sonlu Appliance Ltd.
- JMI Cylinders Ltd.
- JMI Sankur Auto Tank Ltd.
- JMI Sankur Valve & Bung Ltd.
- JMI CNG Dispensing Co. Ltd.
- JMI Safe Transportation Ltd.
- NIPRO JMI Pharma Ltd.
- NIPRO JMI Company Ltd.
- NIPRO JMI Dialysis Centre Ltd.

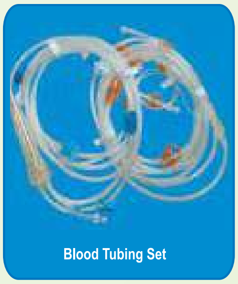

EN ISO 13485:2012 · ISO 9001:2008 · CE EUROPE

World Health Organization · PERFORMANCE QUALITY SAFETY

...Certified

JMI Group

Corporate Office : Unique Heights, (Level-11), 117, Kazi Nazrul Islam Avenue, Ramna, Dhaka-1217, **Tel:** +88-02-55138723-24, **Fax:** +88-02-55138725

Registered Office : 7/A, Shantibag, Dhaka-1217, Bangladesh, **Tel:** +88-02-48318375, 9333102

Email: info@jmigroup-bd.com, **Web:** www.jmigroup-bd.com

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের উপদেষ্টা পরিষদ

শচীন্দ্র চন্দ্র বর্মন

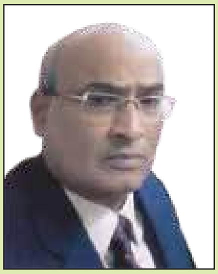
প্রফেসর স্বপন কুমার বনিক

নিতাই চন্দ্র সাহা

ড. রতন চন্দ্র দে

অরুণাভ চক্রবর্তী

প্রণয় কান্তি বিশ্বাস

চন্দন কুমার দে

সঞ্জীব কুমার সাহা

শশাঙ্ক শেখর ভৌমিক

রথীন্দ্র নাথ দত্ত

গৌতম কুমার ঘোষ

আনন্দ মোহন মন্ডল

বাবুল চন্দ্র রায়

অধ্যাপক আরতি দাশ

খোকন কান্তি শর্মা

প্রকৌশলী সনজিত কুমার ঘোষ

বিমল কুমার সাহা

প্রণব সাহা

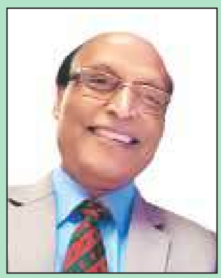
প্রণব কুমার সাহা

অমলেন্দু রায়

ডাঃ চন্দ্র শেখর বোস

ডাঃ রনধীর কুমার কুণ্ডু

ডাঃ সুশংকর কুমার মন্ডল

বিপ্লব কুমার রায়

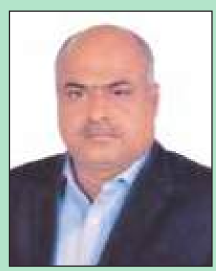
সঞ্জয় চ্যাটার্জী

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের উপদেষ্টা পরিষদ

মহাদেব ঘোষ

সুজিত চ্যাটার্জী

সুবল চন্দ্র রায়

সপ্তম বিশ্বাস, এফসিএ

ড. নিখিল চন্দ্র সরকার

জীবন কৃষ্ণ মোদক

বিপুল কুমার বিশ্বাস

প্রকৌশলী স্বপন কুমার হালদার

ইঞ্জি. ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ

অনুপ কুমার সাহা

অপূর্ব কুমার রাহুত

বিষ্ণুপদ রায়, এফসিএমএ

গোপাল চন্দ্র দেবনাথ, এফসিএ

দেবাশীষ চক্রবর্তী

বিপ্লব কুমার সরকার

লিটন কুমার দাস

নিতাই চন্দ্র মণ্ডল

সঞ্জীব কুমার বণিক

ডাঃ মৌসুমী সরকার

চন্দন কুমার সাহা

নৃপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মধু সূদন মন্ডল

বীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ

অখিল বিশ্বাস

তাপস কুমার সাহা

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের উপদেষ্টা পরিষদ

বিশ্বজিৎ কুমার কর্মকার

রমেশ চন্দ্র ঘোষ

রাহুল রাহা

এস. কে. সিকদার

শ্যামল কুমার মুখার্জী

সাত্যকি কবিরাজ

তাপস কুমার দাস

রাজিব দাশ

সুধীর রঞ্জন দাশ

ইঞ্জি. মিহির কান্তি মজুমদার

ডাঃ দেবব্রত হালদার

প্রদীপ কুমার সূত্রধর

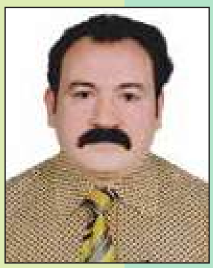
কানাই লাল বণিক

স্বাগতম কুমার সাহা

শ্রী দেবল কুমার দাস

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের কার্য নির্বাহী কমিটি (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

প্রদীপ কুমার সাহা
সভাপতি

শান্তনু দাস বাপ্পী
সহ-সভাপতি

সঙ্গীত কুমার ঘোষ
সহ-সভাপতি

প্রমোদ রঞ্জন রায়
সহ-সভাপতি

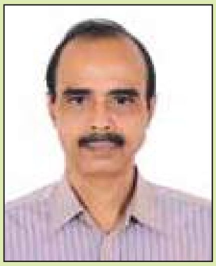
নেপাল দে
সহ-সভাপতি

ভবেশ গোস্বামী
সহ-সভাপতি

শিশির রঞ্জন দাস
সহ-সভাপতি

দীপক লাল কর্মকার
সহ-সভাপতি

সুখলাল নন্দী
সাধারণ সম্পাদক

অশোক ধর
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

অরুন চন্দ্র ভৌমিক
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

হীরালাল বাইন
অর্থ সম্পাদক

ঝন্টু চন্দ্র সাহা
সহ-অর্থ সম্পাদক

মৃত্যুঞ্জয় রায়
সাংগঠনিক সম্পাদক

শ্যামল মিত্র
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক

বিশ্বজিত রায়
দপ্তর সম্পাদক

প্রবীর কুমার সরকার
প্রচার সম্পাদক

প্রিয়লাল শর্মা
সহ-প্রচার সম্পাদক

এড. বিনয় কৃষ্ণ পোদ্দার
আইন বিষয়ক সম্পাদক

গোপাল চন্দ্র দত্ত
গণ সংযোগ সম্পাদক

প্রকাশ কুমার দাস
গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক

রতন কুমার রায়
সহ-গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক

অরুণ চৌধুরী
সাংস্কৃতিক সম্পাদক

প্রদীপ কুমার সাহা
সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক

মানিক লাল দাস
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের কার্য নির্বাহী কমিটি (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

কেশব সেন
আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক

রনধীর বিশ্বাস
ধর্মীয় বিষয়ক সম্পাদক

কবিতা রাণী পাল
মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক

নমিতা চক্রবর্তী
সহ-মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক

অসীম কুমার দাশ
ছাত্র, যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক

দীপ্তি সাহা
পূজা বিষয়ক সম্পাদক

মিনা ভৌমিক
সহ-পূজা বিষয়ক সম্পাদক

সুবিমল শিকদার
শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক

গৌর চন্দ্র ঘোষ
সদস্য

নারায়ন চন্দ্র দে
সদস্য

বকুল রানী দেবী
সদস্য

লিটন চন্দ্র দাস
সদস্য

মিলন কৃষ্ণ দাস
সদস্য

ইঞ্জি. উত্তম কুমার দাস
সদস্য

সনৎ দত্ত
সদস্য

বাবুল চন্দ্র ঘোষ
সদস্য

মিহির মজুমদার
সদস্য

সুভাষ মজুমদার
সদস্য

যদু নাথ ঘোষ
সদস্য

রতন কুমার মজুমদার
সদস্য

অমরেশ চন্দ্র দাস
সদস্য

সুদীপ কুমার ভদ্র
সদস্য

উজ্জ্বল কুমার বৈদ্য
সদস্য

জয়ন্তী রাণী ধর
সদস্য

মিতালী রায় চৌধুরী
সদস্য

মনিকা শর্মা
সদস্য

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্যবৃন্দ

কনিকা রানী পাল

গৌরী কর্মকার

স্বর্ণা সেন

মিনি রানী কীর্ত্তনীয়

মিনতি শর্মা

রীতা রায়

মাধবী প্রভা দাস

কনিকা শর্মা

টুম্পা দাস

দুলাল দেবনাথ

নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চন্দন দেবনাথ

সঞ্জয় কুমার দাস

নির্মল কান্তি ওঝা

বিজন বিশ্বাস

রাম প্রাসাদ

জয়শ্রী শর্মা

রনজিৎ কুমার পাল

সমীর চন্দ্র দত্ত

আলোকা রাণী সরকার

চঞ্চল চৌধুরী

বিমল কৃষ্ণ দেব

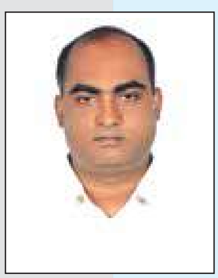
স্বপন দাস

চঞ্চলা সরকার

পরিমল চন্দ্র পাল

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্যবৃন্দ

রনজিৎ কুমার সরকার

উষা রাণী দত্ত

গোবিন্দ হালদার

বিপুল কান্তি রায়

রতন বিশ্বাস

প্রদীপ কুমার বাড়ৈ

প্রদীপ কুমার সেন

দেবেশ চন্দ্র সরকার

সঞ্জীব মৈত্র

সাগর মজুমদার

তনুশ্রী রাণী পাল

সুপ্রীয়া রাণী সাহা

রতন কুমার মিত্র

ছোটন কুমার দে

সুমন ঘোষ

মৌসুমী রায়

সুমন দে

ভবেশ কুমার শর্মা

নির্মল চন্দ্র নাথ

সঞ্জিত কুমার দেবনাথ

শংকর কর্মকার

প্রণব কুমার রায়

তপন মিত্র

রীতা অধিকারী

বিমল হালদার

ইঞ্জি. সুব্রত দেবনাথ

শিবু কুমার দাস

অসীম কুমার দে

অনন্যা রায় তমা

সুজিত দেবনাথ

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্যবৃন্দ

রক্তিম সরকার

রঞ্জিত কুমার নাথ

বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস

রিপন সাহা

দীপক কুমার দাস

প্রদীপ কুমার পাল

গণেশ চন্দ্র বিশ্বাস

নীতিশ কুমার দাশ

তাপসী ঘোষ

বিউটি রাণী ঘোষ

পরিমল কুমার বিশ্বাস

রাজীব দাশ

শ্যামল কুমার দাস

দেবব্রত চক্রবর্তী

রত্না মোদক

লিপি কর্মকার

সংগীতা রায়

রিতা দেবনাথ

আরতী বসাক

শ্রীমতি পলি বসাক

লিটন কান্তি সুশীল

প্রদীপ কুমার পাল

রূপেন দেবনাথ (লিটন)

সুবর্ণা দাস

নিমাই চন্দ্র দাস

তেজগাঁও সনাতন ছাত্র ও যুব উন্নয়ন পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি

কমল কান্তি রায়
সভাপতি

সুজিত ঘোষ
সহ সভাপতি

বিক্রম চন্দ্র দাস
সহ সভাপতি

রতন কুমার সরকার
সহ সভাপতি

শুভ্রদেব মিত্র
সহ সভাপতি

অনিন্দ রায়
সহ সভাপতি

অশ্রু রায়
সহ সভাপতি

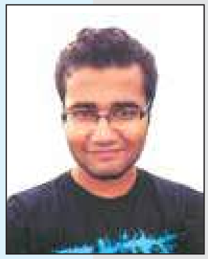

বিনয় শর্মা
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

পার্থ বাড়ৈ
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

সাগর ঘোষ
আইন বিষয়ক সম্পাদক

শাওন মিত্র
কোষাধ্যক্ষ

দেবব্রত রায় শুভ
সাংগঠনিক সম্পাদক

দীপ্ত রায়
সাংগঠনিক সম্পাদক

রাহুল চন্দ্র দাস
সাংগঠনিক সম্পাদক

মিহির মন্ডল
দপ্তর সম্পাদক

সমীর রায়
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক

মেঘনাথ বিশ্বাস
সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক

সজল দাস
শিশু কিশোর বিষয়ক সম্পাদক

অঞ্জন শর্মা
পুজা ও ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক

আশিষ মল্লিক
সদস্য

সুরঞ্জিত গুপ্ত
সদস্য

শ্রাবণ মজুমদার
সদস্য

হৃদয় সরকার
সদস্য

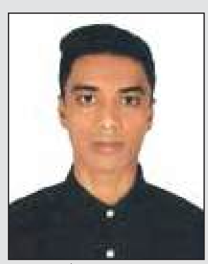

সৌরভ সুর
সদস্য

হৃদয় শর্মা
সদস্য

তেজগাঁও সনাতন ছাত্র ও যুব উন্নয়ন পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি

সাগর মন্ডল
সদস্য

দুর্জয় চন্দ্র দাস
সদস্য

ভাস্কর পান্ডে
সদস্য

বিবেক রায়
সদস্য

মিলন দত্ত
সদস্য

তেজগাঁও সনাতন ছাত্র ও যুব উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্য

অদ্রি দাশ কথা

প্রিয়াংকা শর্মা

প্রকৃতা বাইন পাপড়ি

তিথি ঋতুপর্ণা দত্ত

অর্পিতা পাল

মিলেনিয়াম রায় পুজা

অদিতি বিশ্বাস

শাশ্বতি বিশ্বাস

অমিত মজুমদার

শিশির মন্ডল

অন্তর চন্দ্র দাস

অসিত মন্ডল

উমেশ চন্দ্র ঘোষ

নিলয় চন্দ্র দাস

সমীরণ কুমার ঘোষ

তেজগাঁও সনাতন ছাত্র ও যুব উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্য

মনোজ ঘোষ

রাহুল কান্তি সরকার

সৈকত চন্দ্র দাস

অভিজিত রায়

ঝন্টু বাগচী

নরোত্তম মল্লিক

অনুপম পাত্র

নয়ন চন্দ্র দাস

নীহার রঞ্জন বাড়ৈ

রানা চন্দ্র দাস

সজল কুমার বিশ্বাস

শুভ চন্দ্র দাস

অপু দাস

দীপ্ত ঘোষ

দীপঙ্কর হালদার

প্রীতম কৃষ্ণ ঘোষ

অনুপম মন্ডল

পংকজ রায়

প্রসেনজিৎ বর্মন

বিধান বাড়ৈ

অজয়

সবুজ বাড়ৈ

সুবীর বাড়ৈ

নান্টু চন্দ্র দাস

সুদাম চন্দ্র দাস

অনুপ হালদার

স্বপন চন্দ্র দাস

তেজগাঁও সনাতন ছাত্র ও যুব উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্য

প্রণব বাড়ৈ

অনিক চন্দ্র দাস

প্রীতম বিশ্বাস (দ্বীপ)

পাপিয়া বাইন

দীনবন্ধু বিশ্বাস

সুকৃতি কুমার রায়

জনি চন্দ্র দাস

সাগর কুমার দে

জয়ন্ত মন্ডল

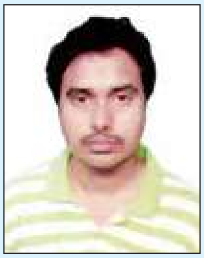
উজ্জ্বল চন্দ্র দাস

মনোজ ঘোষ

উমেশ ঘোষ

রাজীব অধিকারী

প্রমা বালা

প্রিয়াংকা ঘোষ

জয়িতা মিত্র

অনামিকা রাণী ধর

প্রথমা শর্মা

অংকিতা ধর

অনুপম সরকার

প্রদীপ্ত কুমার দেব

সজল চন্দ্র দাস

সখ্য স্বরূপ সাহা

রত্না বর্মন

বলাই চন্দ্র বসাক

জ্যোতিশ কুমার রায়

মিঠুন চক্রবর্তী

সঞ্জিত সূত্রধর

দীপন হাওলাদার

মনোজ মণ্ডল

তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা

১৬ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

ফোন: ৪৮১১৩৬২৮,৪৮১১৭০০৮ মোবাইল: ০১৭৯৮১৪৪০৭২

উন্নয়ন অভিযাত্রায় লক্ষ্য এবার স্মার্ট তেজগাঁও কলেজ

স্নাতক(সম্মান) কোর্সসমূহ

কলা অনুষদ	বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ইসলামিক স্টাডিজ ও দর্শন।
ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ	হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, মার্কেটিং ও ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং।
বিজ্ঞান অনুষদ	প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রানিবিদ্যা, পরিসংখ্যান, ভূগোল ও পরিবেশ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ও মনোবিজ্ঞান।
সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ	অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম।

স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স) কোর্সসমূহ

মাস্টার্স ১ম পর্ব	ইংরেজি, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, মার্কেটিং, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞান।
মাস্টার্স শেষ পর্ব	বাংলা, ইংরেজি, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, মার্কেটিং, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং, প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান, রসায়ন,গণিত, ভূগোল ও পরিবেশ, মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম।

প্রফেশনাল স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্সসমূহ

- বিএসসি এবং এমএসসি ইন কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
- বিবিএ এবং এমবিএ
- থিয়েটার এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ
- বিবিএ এবং এমবিএ ইন ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট

অধ্যাপক ড. খন্দকার বজলুল হক
সভাপতি, তেজগাঁও কলেজ গভর্নিং বডি

www.tejgaoncollege.edu.bd
E-mail: tejgaoncollege@ymail.com

প্রফেসর ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ
অধ্যক্ষ, তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা

আজকের সঞ্চয় দুর্দিনের বন্ধু

দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিঃ

মাসিক সঞ্চয় ডিপোজিট (এমএসডি), হাউজিং প্রকল্প, ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প, শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প, হাসপাতাল প্রকল্প, হোস্টেল প্রকল্প, পরিবহন প্রকল্প, বিশুদ্ধ জল বোতলজাত প্রকল্প, সমবায় বিপণী প্রকল্প, বুটিক শপ প্রকল্প, হোম সার্ভিস প্রকল্প, বৃদ্ধাশ্রম প্রকল্পসহ প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কাজ করা।

- ☛ সদিচ্ছাই সঞ্চয়ে সাহস যোগায়।
- ☛ মিতব্যয়ী হোন, সঞ্চয় করুন।
- ☛ আজকের সঞ্চয় আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।
- ☛ সঞ্চয় করে যে, উন্নতি করে সে।

দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিঃ-এ সঞ্চয় করুন, স্বাবলম্বী হোন।

সমিতির মূল লক্ষ্য:

সমিতির সদস্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অত্র প্রতিষ্ঠানটি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সদস্যদের আর্থিকভাবে স্বচ্ছল করে তোলা।

উদ্দেশ্যাবলি:

ক. অপেক্ষাকৃত অস্বচ্ছল, নির্যাতিত ও সামাজিকভাবে অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সহযোগিতা করা।

খ. সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করে সঞ্চয়মুখী করার মাধ্যমে তাদেরকে পারিবারিকভাবে ও সামাজিকভাবে উন্নত করা।

গ. প্রতিষ্ঠানের তহবিল বৃদ্ধির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা।

ঘ. সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে স্ব স্ব পেশায় প্রতিষ্ঠিত করা।

ঙ. সদস্যদের প্রয়োজনে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা।

চ. বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা।

ছ. দরিদ্র ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ডায়গনোস্টিক সেন্টার/ক্লিনিক/হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা।

জ. সদস্যদের আবাসন সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে হাউজিং প্রকল্প চালু করা।

ঝ. সর্বোৎকৃষ্টমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

ঞ. মেধাবী ও অস্বচ্ছল ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ও শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা।

সমিতির বর্তমান কার্যক্রম:

সমিতির সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে আর্থিক উন্নতির জন্য

- **ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প:** সমিতির সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ চলমান।
- **সমবায় বিপণী প্রকল্প:** তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও-এ সমবায় বিপণী চালু হয়েছে। এই প্রকল্প পর্যায়ক্রমে ঢাকার সর্বত্র চালু হবে। সমবায় বিপণী তেজগাঁও প্রকল্পে মূলধন/বাজেট ৫০ লক্ষ টাকা। মূলধন সংগ্রহের জন্য সমিতির সদস্যদের কাছে শেয়ার বিক্রি শুরু হয়েছে।
- **বুটিক শপ প্রকল্প:** খুব শীঘ্রই বুটিক শপ প্রকল্পটি মহিলা সদস্যাদের নিয়ে চালু হবে।
- **হাউজিং প্রকল্প:** তেজকুনিপাড়া, তেজগাঁওসহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকা, ঢাকার উপশহরে সমিতির সদস্যদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য সমিতির সদস্যদের মাঝে যৌথ উদ্যোগে জমি ক্রয় করে তাতে এ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ করে কিস্তি সুবিধার মাধ্যমে ফ্ল্যাট দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে তেজকুনিপাড়া, তেজগাঁও-এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য অপরাজিতা হাউজিং সোসাইটি গঠন করা হয়েছে।
- **হোস্টেল প্রকল্প:** ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য শীঘ্রই হোস্টেল চালু হবে।
- **ডায়গনোস্টিক সেন্টার:** সমিতির সদস্যদের স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে প্রকল্পটি শীঘ্রই চালু হবে।

সদস্য হওয়ার নিয়মাবলি:

- ➤ সদস্য ভর্তি ফি ১০০ টাকা।
- ➤ মাসিক সঞ্চয় ৩০০ টাকা তবে কেউ ইচ্ছা করলে ৬০০/৯০০/১২০০ টাকা বা আরও অধিক সঞ্চয় করতে পারবেন, জমার আনুপাতিক হারে লভ্যাংশ পাবেন। ভর্তির সময় ৪ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র (যদি থাকে) জমা দিতে হবে।

সদস্য হওয়ার যোগ্যতা:

ক. যারা রাষ্ট্রবিরোধী কোনো কাজে লিপ্ত নাই কিংবা রাষ্ট্রীয়ভাবে দণ্ডপ্রাপ্ত নন।

খ. যারা পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববন্ধনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে সমবায়ভিত্তিতে কাজ করতে আগ্রহী।

গ. যারা নিয়মিত ও নির্ধারিত ডিপোজিট/সঞ্চয় প্রদানে সক্ষম।

ঘ. যারা অত্র প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করবেন।

ঙ. ১৮ বছরের উপরের হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকল নারী/পুরুষ। তবে ১৮ বছরের নিচে অর্থাৎ নাবালকের ক্ষেত্রে তার অভিভাবক উক্ত হিসাব পরিচালনা করতে পারবেন।

ঠিকানা: সবার বাজার ডটকম, ১৫৩ তেজকুনিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা ১২১৫
যোগাযোগ: ০১৭১১ ৯০৫২০৬, ০১৭১১ ৫২৮২২০, ০১৯৭১ ৯৭৪৫৭৯

দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিঃ এর কার্যকরী কমিটি

১০, খেলাঘর ক্লাব মার্কেট, তেজকুনিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

শচীন্দ্র চন্দ্র বর্মণ
সভাপতি

সুখলাল নন্দী
সহ-সভাপতি

সান্তনু দাস
সাধারণ সম্পাদক

যদুনাথ ঘোষ
যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক

লিটন চন্দ্র দাস
কোষাধ্যক্ষ

মৃত্যুঞ্জয় রায় তপন
সদস্য

নেপাল দে
সদস্য

নমিতা চক্রবর্তী
সদস্য

গৌর চন্দ্র ঘোষ
সদস্য

বিপুল চন্দ্র বার
সদস্য

এ্যাড: সাগর কুমার ঘোষ
সদস্য

দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিঃ-এর সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম	ক্রমিক নং	সদস্যের নাম
১.	শ্রী শচীন্দ্র চন্দ্র বর্মন	৩৮.	শ্রী দুলাল দেবনাথ
২.	শ্রী অরুণ চন্দ্র ভৌমিক	৩৯.	শ্রী অপূর্ব কুমার রাহুত
৩.	শ্রী সুখলাল নন্দী	৪০.	শ্রী রনজিৎ কুমার সরকার
৪.	শ্রী প্রিয়লাল শর্মা	৪১.	শ্রীমতি শুক্লা বিষ্ণু
৫.	শ্রী হিরালাল বাইন	৪২.	শ্রী গৌর চন্দ্র ঘোষ
৬.	শ্রী মৃত্যুঞ্জয় রায় (তপন)	৪৩.	শ্রী চঞ্চল চৌধুরী
৭.	শ্রী শিশির রঞ্জন দাস	৪৪.	শ্রীমতি উষা রানী দত্ত
৮.	শ্রী প্রমোদ রঞ্জন রায়	৪৫.	শ্রীমতি নমিতা রায়
৯.	শ্রী নেপাল দে	৪৬.	শ্রী বিমল হালদার
১০.	শ্রী সঞ্জীব মৈত্র	৪৭.	শ্রী গোবিন্দ হালদার
১১.	শ্রী রনধীর বিশ্বাস	৪৮.	শ্রী প্রদীপ কুমার বাড়ৈ
১২.	শ্রী প্রবীর কুমার সরকার	৪৯.	শ্রী নারায়ণ চন্দ্র সাহা
১৩.	শ্রী প্রদীপ কুমার সাহা	৫০.	শ্রী সনৎ দত্ত
১৪.	শ্রী শ্যামল মিত্র	৫১.	শ্রী লিটন চন্দ্র দাস
১৫.	শ্রী ভবেশ গোস্বামী	৫২.	শ্রীমতি বীণা রানী দাস
১৬.	শ্রী কেশব সেন	৫৩.	শ্রী বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস
১৭.	শ্রী শ্যামল কুমার দাস	৫৪.	শ্রীমতি চঞ্চলা সরকার
১৮.	শ্রী অশোক কুমার ধর	৫৫.	শ্রীমতি শাশ্বতী বিশ্বাস
১৯.	শ্রী বিশ্বজিৎ চন্দ্র শীল	৫৬.	শ্রীমতি অদিতি বিশ্বাস
২০.	শ্রী সংগীত কুমার ঘোষ	৫৭.	ডাঃ চন্দ্রশেখর বোস
২১.	শ্রীমতি কবিতা রানী পাল	৫৮.	শ্রী বাবুল চন্দ্র ঘোষ
২২.	শ্রীমতি নমিতা চক্রবর্তী	৫৯.	শ্রী নারায়ণ চন্দ্র দে
২৩.	শ্রী বিশ্বজিৎ কুমার পাল	৬০.	শ্রী রবীন্দ্রনাথ বর্মন
২৪.	শ্রী সান্তনু দাস বাপ্পী	৬১.	শ্রী রামপ্রসাদ সরকার
২৫.	শ্রী মানিক লাল দাস	৬২.	শ্রী শিবু কুমার দাস
২৬.	শ্রী বিমল কৃষ্ণ দেব	৬৩.	শ্রী প্রকাশ কুমার দাস
২৭.	শ্রী চন্দন দেবনাথ	৬৪.	শ্রী নরেশ চন্দ্র দত্ত
২৮.	শ্রী দীপক লাল কর্মকার	৬৫.	শ্রী বিশ্বজিৎ কর্মকার
২৯.	শ্রী মিলন কৃষ্ণ দাস	৬৬.	শ্রী দেবেশ চন্দ্র সরকার
৩০.	শ্রী বিজন কুমার বিশ্বাস	৬৭.	শ্রীমতি অলকা রানী সরকার
৩১.	শ্রী রতন কুমার বিশ্বাস	৬৮.	এ্যাড. বিনয় কৃষ্ণ পোদ্দার
৩২.	শ্রী স্বপন দাস	৬৯.	শ্রী রতন কুমার রায়
৩৩.	শ্রী গোপাল চন্দ্র দেবনাথ	৭০.	শ্রী সুভাষ মজুমদার
৩৪.	শ্রীমতি বকুল রানী দেবী	৭১.	শ্রী সমীর চন্দ্র দত্ত
৩৫.	শ্রী প্রদীপ সেন	৭২.	শ্রী পরিমল চন্দ্র পাল
৩৬.	শ্রী গোপাল চন্দ্র দত্ত	৭৩.	শ্রী অমরেশ চন্দ্র দাস
৩৭.	শ্রী উজ্জ্বল কুমার বৈদ্য	৭৪.	শ্রীমতি মিতালি রায় চৌধুরী

দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিঃ-এর সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম	ক্রমিক নং	সদস্যের নাম
৭৫.	শ্রী পরিমল কুমার বিশ্বাস	১১২.	শ্রী খোকন মালাকার
৭৬.	শ্রী ঝন্টু চন্দ্র সাহা	১১৩.	শ্রী প্রদীপ কুমার পাল
৭৭.	শ্রীমতি জয়শ্রী শর্মা	১১৪.	শ্রী অশ্রু রায়
৭৮.	শ্রী অসীম কুমার দাশ	১১৫.	শ্রী পরেশ দেবনাথ
৭৯.	শ্রী সুবিমল সিকদার	১১৬.	শ্রী আশিষ চন্দ্র শর্মা
৮০.	শ্রী উত্তম কুমার দাস	১১৭.	শ্রী শিশির চন্দ্র শর্মা
৮১.	শ্রীমতি টুম্পা দাস	১১৮.	শ্রী প্রবীর চন্দ্র শর্মা
৮২.	শ্রীমতি মিনতি শর্মা	১১৯.	এ্যাড: সাগর কুমার ঘোষ
৮৩.	শ্রী রনজিৎ কুমার পাল	১২০.	শ্রী অরুণ কুমার দে
৮৪.	শ্রী চন্দন কুমার মজুমদার	১২১.	শ্রী অসীম কুমার দে
৮৫.	শ্রীমতি প্রিয়াংকা সরকার	১২২.	শ্রী সুদীপ কুমার ভদ্র
৮৬.	শ্রীমতি রিতা অধিকারী	১২৩.	শ্রী নান্টু চন্দ্র দাস
৮৭.	শ্রী অমর চন্দ্র দত্ত	১২৪.	শ্রী সুমন চন্দ্র দাস
৮৮.	শ্রী জীবন কৃষ্ণ মোদক	১২৫.	শ্রী সজল চন্দ্র দাস
৮৯.	ডা: কল্যাণী রানী দত্ত	১২৬.	শ্রী রতন সরকার
৯০.	শ্রী স্বপন কুমার কুন্ডু	১২৭.	শ্রী বাসুদেব তালুকদার
৯১.	শ্রী চন্দন কুমার সাহা	১২৮.	শ্রীমতি বিউটি রানী দত্ত
৯২.	শ্রী মিনি রানী কীর্ত্তনীয়া	১২৯.	শ্রীমতি সবিতা রানী দাস
৯৩.	শ্রীমতি মনিকা শর্মা	১৩০.	শ্রী সুসেন শর্মা
৯৪.	শ্রী খোকন শর্মা	১৩১.	শ্রীমতি পলি রানী শর্মা
৯৫.	শ্রীমতি কণিকা শর্মা	১৩২.	শ্রী গণেশ চন্দ্র বিশ্বাস
৯৬.	শ্রী বিষ্ণু কুমার রায়	১৩৩.	শ্রী অনিল কৃষ্ণ বিশ্বাস
৯৭.	শ্রী রণজিত কর্মকার	১৩৪.	শ্রী শচীন্দ্র কুমার সরকার
৯৮.	শ্রী সঞ্জয় বিশ্বাস (ডন)	১৩৫.	শ্রী সুব্রত কুমার বিশ্বাস
৯৯.	শ্রী সবুজ দাস	১৩৬.	শ্রী প্রবীর কুমার বিশ্বাস
১০০.	শ্রী বিক্রম চন্দ্র দাস	১৩৭.	শ্রীমতি দেবশ্রী দাস
১০১.	শ্রী সুকৃতি কুমার রায়	১৩৮.	শ্রীমতি ঝর্ণা রানী পাল
১০২.	শ্রীমতি নিপা গাইন	১৩৯.	শ্রী মিহির মজুমদার
১০৩.	শ্রীমতি অমৃতা রায় জুঁই	১৪০.	শ্রী দীপংকর পাল
১০৪.	শ্রীমতি অর্থী রায় জবা	১৪১.	শ্রী হৃদয় চন্দ্র দাস
১০৫.	শ্রী রাহুল কান্তি সরকার	১৪২.	শ্রী দীনেশ চন্দ্র দাস
১০৬.	শ্রীমতি মনিকা রানী দাস	১৪৩.	শ্রী উত্তম চন্দ্র দাস
১০৭.	শ্রী সৈকত মজুমদার (সাগর)	১৪৪.	শ্রী মনোজ মন্ডল
১০৮.	শ্রীমতি সবিতা রানী মন্ডল	১৪৫.	শ্রীমতি নীলা রানী রায়
১০৯.	শ্রী স্বপন মজুমদার	১৪৬.	শ্রীমতি অদিতি দত্ত
১১০.	শ্রীমতি বন্দনা রানী মজুমদার	১৪৭.	শ্রীমতি আরতি দাশ পোদ্দার
১১১.	ড. নিখিল চন্দ্র সরকার	১৪৮.	শ্রীমতি অনন্যা রায়

দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম	ক্রমিক নং	সদস্যের নাম
১৪৯.	শ্রী রত্নেশ্বর দাস	১৮৭.	শ্রী পরেশ নাথ বর্মন
১৫০.	শ্রীমতি তাপসী দাস	১৮৮.	শ্রী জিতেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস
১৫১.	শ্রী সঞ্জিব কুমার দাস	১৮৯.	শ্রী মিহির মন্ডল
১৫২.	শ্রীমতি ইলা রাণী সরকার	১৯০.	শ্রী অনিমেষ সাহা
১৫৩.	শ্রী বিশ্বনাথ দত্ত	১৯১.	শ্রী ক্ষীতিশ চন্দ্র রায়
১৫৪.	শ্রী বিভোর চন্দ্র দাস	১৯২.	শ্রীমতি কনিকা রায়
১৫৫.	শ্রী নির্মল চন্দ্র হাওলাদার	১৯৩.	শ্রী অর্জ্জুন কুমার রায়
১৫৬.	শ্রী অজয় মিত্র	১৯৪.	শ্রী প্রীতম কৃষ্ণ ঘোষ
১৫৭.	শ্রী শেখর দাস	১৯৫.	শ্রী রঘুনাথ বাড়ৈ
১৫৮.	শ্রীমতি রীতা রাণী বর্মন	১৯৬.	শ্রী আনন্দ কুমার মজুমদার
১৫৯.	শ্রী প্রসেনজিৎ বর্মন	১৯৭.	শ্রীমতি মৌসুমী মজুমদার
১৬০.	শ্রী বলাই চন্দ্র উড়াও	১৯৮.	শ্রী রিংকু করিবাজ রাহুল
১৬১.	শ্রী ছোটন কুমার দে	১৯৯.	শ্রীমতি সুপ্রিয়া রাণী সাহা
১৬২.	শ্রী নিহার রঞ্জন মজুমদার	২০০.	শ্রী নিমাই চন্দ্র দাস
১৬৩.	শ্রীমতি শ্যামলী রানী দাস	২০১.	শ্রীমতি লিপি রাণী রায়
১৬৪.	শ্রী সমীর চন্দ্র সেন	২০২.	শ্রী মাঞ্জীর কুমার দাস
১৬৫.	শ্রীমতি শিপ্রা রানী পাল	২০৩.	শ্রী মৃনাল কান্তি বর্মন
১৬৬.	শ্রী উত্তম কুমার দত্ত	২০৪.	শ্রী নির্মল চন্দ্র ঘোষ
১৬৭.	শ্রীমতি প্রিয়াংকা দত্ত	২০৫.	শ্রী পরিতোষ বর্মন
১৬৮.	শ্রী বিমল চৌধুরী	২০৬.	শ্রী কমল কান্তি রায়
১৬৯.	শ্রী চিরঞ্জীৎ গোস্বামী	২০৭.	শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস
১৭০.	শ্রীমতি আরতি বসাক	২০৮.	শ্রীমতি সীমা রাণী দেবনাথ
১৭১.	শ্রীমতি পলি বসাক	২০৯.	শ্রী মানব কুমার দাস
১৭২.	শ্রীমতি প্রতিমা বসাক	২১০.	শ্রীমতি সুনিতী হালদার
১৭৩.	শ্রী বিপুল চন্দ্র বার	২১১.	শ্রী জীবিতেশ্বর রায় জীবন
১৭৪.	শ্রীমতি মনিকা রানী বার	২১২.	শ্রী জ্যোতিশ চন্দ্র
১৭৫.	শ্রী এমএম দাস রঞ্জন	২১৩.	শ্রী জুয়েল ধর
১৭৬.	শ্রীমতি রীতা দেবী	২১৪.	শ্রী রতন কুমার সাহা
১৭৭.	শ্রী রিপন সাহা	২১৫.	শ্রী প্রদীপ কুমার সাহা
১৭৮.	শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	২১৬.	শ্রী গোপীনাথ নাগ
১৭৯.	শ্রীমতি জয়ন্তী রাণী ধর	২১৭.	শ্রীমতি লিলি বিশ্বাস
১৮০.	শ্রী রাতুল দাস	২১৮.	শ্রীমতি দীপ্তি সাহা
১৮১.	শ্রী রাহুল দাস	২১৯.	শ্রী দোলন কান্তি দত্ত
১৮২.	শ্রী জয়ন্ত ঘরামী	২২০.	শ্রীমতি মিনা ভৌমিক
১৮৩.	শ্রীমতি মাধবী সরকার	২২১.	শ্রী সুভাশ চন্দ্র দাস
১৮৪.	শ্রীমতি বিউটি রানী দাস	২২২.	শ্রী যদুনাথ ঘোষ
১৮৫.	শ্রীমতি প্রণতি চক্রবর্তী	২২৩.	শ্রীমতি পম্পা দে
১৮৬.	শ্রীমতি মমতা সরকার		

কৃষিই সমৃদ্ধি

জাতীয় কৃষি গবেষনা প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণা সমন্বয়ের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। কাউন্সিল সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণা কার্যক্রম সমন্বয় করে উন্নত জাত, লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে টেকসই খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় সরকারের কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা করে। কাউন্সিলের সাম্প্রতিক উল্লেখ্যযোগ্য সাফল্যসমূহ নিম্নরূপ:

- জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের শীর্ষ সংস্থা হিসেবে কৃষি গবেষণায় নীতি-নির্ধারণের জন্য গবেষণা অগ্রাধিকার ও ভিশন ডকুমেন্ট ২০৩০ প্রণয়ন
- মাটি, জলবায়ু ও এলাকা উপযোগী ফসল নির্বাচন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রপ জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন
- জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের বিজ্ঞানীদের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ এর জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৫ প্রণয়ন
- জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ রোডম্যাপ ২০২১, ২০৩১ ও ২০৪১ প্রণয়ন।
- বিএআরসি কর্তৃক জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির মাধ্যমে বিগত ১০ বছরে এনএআরএস প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত ১৭০ টিরও বেশি জাত ছাড়করণের সুপারিশ করা হয়েছে।
- ফসলের সারের মাত্রা সুপারিশ করে সার সুপারিশমালা হাতবই-২০১৮ বাংলা ও ইংরেজীতে প্রণয়ন করা হয়েছে, যা অনলাইন সেবা হিসেবে বিএআরসি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে।
- জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প-১ এর মাধ্যমে ২০০৭-২০১৪ মেয়াদে এনএআরএস প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের দেশে ৭৮টি ও বিদেশে ৩০টি পিএইচডি প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের ৫০টিরও অধিক নতুন জাত ও উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে।
- জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প-২ প্রকল্পটি ২০১৫-২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের অর্থায়নে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর থেকে ১৯০টি Competitive Research Grants ও ৫১টি Program Based Research Grants উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ ছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় এনএআরএস প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের দেশে ৮০টি ও বিদেশে ৬০টি পিএইচডি প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে।
- বাংলাদেশের ব্লু ইকোনোমি প্রসারে সামুদ্রিক শৈবাল কৃত্রিমভাবে চাষাবাদ করার লক্ষ্যে বিএআরসি'র সমন্বয়ে ২০১৬ সাল হতে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নে সহোযোগিতামূলক কর্মকান্ড জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশ, বিশ্ববিদ্যালয় ও আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা সংস্থার সাথে ৪০টির অধিক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

নূতন বিমান বন্দর সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

ফোন: +৮৮০-২-৯১৩৫৫৮৭, +৮৮০-২-৯১১০৮৪২;

ই-মেইল: ec-barc@barc.gov.bd, info@barc.gov.bd

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের-

রুপকল্প (Vision) : সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও মানসম্পন্ন প্রাণিজ আমিষ সরবরাহকরণ

অভিলক্ষ্য (Mission) : প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের মধ্যেমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ

- বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিগত ১২ বছরে দুধের উৎপাদন প্রায় ৪ গুণের অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে
- মাংসের উৎপাদন প্রায় ৬ গুণ এবং ডিমের উৎপাদন প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে
- মাথা পিছু প্রাণিজ আমিষ গ্রহণের হারও কয়েকগুন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ৫ লক্ষ ৯৮ হাজার খামারীর মাঝে ৬৯৯ কোটি টাকা প্রণোদনা হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে
- বর্তমানে মাংস উৎপাদন ৮৪.৪০ লক্ষ মে.টন, দুধ উৎপাদন ১১৯.৮৫ লক্ষ মে.টন এবং ডিম উৎপাদন ২০৫৭.৬৪ কোটি পিছ। বর্তমানে আমরা মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

SQ CABLES
Speaks Safety & Quality
SKIN
COATED
CABLES
Our Quality Assures Safety.
BUET
ANAB
A Concern Of
SQ GROUP
Total Power Solution
+88 01755-661166
info@sqgroupbd.com
www.sqgroupbd.com

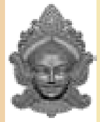

শারদীয় দুর্গপূজার ইতিবৃত্ত

কেশব সেন

দুর্গাপূজা বা দুর্গোৎসব হল দেবী দুর্গার পূজাকে কেন্দ্র করে ভারত উপমহাদেশে প্রচলিত একটি হিন্দু উৎসব। এটি সারা বিশ্বে হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্বারা পালিত হয়, তবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ওড়িশা, বিহার, ত্রিপুরা, ঝাড়খন্ড, উত্তর প্রদেশ (পূর্বাঞ্চল) এবং বাংলাদেশে ঐতিহ্যগত বিশেষভাবে উদযাপিত হয়। এটি বাংলা বর্ষপঞ্জির আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজা মূলত দশ দিনের উৎসব, যার মধ্যে শেষ পাঁচটি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। আশ্বিনের নবরাত্রির পূজা শারদীয় পূজা এবং বসন্তের নবরাত্রির পূজা বাসন্তিক বা বসন্তকালীন দুর্গাপূজা নামে পরিচিত। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে কলকাতার দুর্গাপূজা ইউনেস্কোর অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় যুক্ত করা হয়।

দুর্গাপূজা ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল সহ ভারতীয় উপমহাদেশ ও বিশ্বের একাধিক রাষ্ট্রে পালিত হয়ে থাকে। তবে সনাতনী বাঙালির প্রধান উৎসব হওয়ার দরুন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যে ও বাংলাদেশে দুর্গাপূজা বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়। এমনকি ভারতের আসাম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, মণিপুর এবং ওড়িশা রাজ্যেও দুর্গাপূজা মহাসমারোহে পালিত হয়ে থাকে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে প্রবাসী বাঙালি সনাতনীগণ ও স্থানীয় জনসাধারণ নিজ নিজ প্রথা মাফিক শারদীয়া দুর্গাপূজা বা নবরাত্রি উৎসব পালন করে। এমনকি পাশ্চাত্য দেশগুলোতে কর্মসূত্রে বসবাসরত বাঙালি হিন্দুরাও দুর্গাপূজা পালন করে থাকেন। ২০০৬ সালে গ্রেট ব্রিটেনের রাজধানী লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গ্রেট হলে "ভয়েসেস অফ বেঙ্গল" মরসুম নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীর অঙ্গ হিসেবে স্থানীয় বাঙালি সনাতনী অভিবাসীরা ও জাদুঘর কর্তৃপক্ষ এক বিরাট দুর্গাপূজার আয়োজন করেন।

সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠ থেকে দশম দিন পর্যন্ত শারদীয়া দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পাঁচটি দিন যথাক্রমে "দুর্গাষষ্ঠী", "দুর্গাসপ্তমী", "মহাষ্টমী", "মহানবমী" ও "বিজয়া দশমী" নামে পরিচিত। আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষটিকে বলা হয় "দেবীপক্ষ"। দেবীপক্ষের সূচনার অমাবস্যাটির নাম মহালয়া; এই দিন সনাতনীরা তর্পণ করে তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। দেবীপক্ষের শেষ দিনটি হল কোজাগরী পূর্ণিমা। এই দিন সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দেবী লক্ষ্মীর পূজা করা হয়। কোথাও কোথাও পনেরো দিন ধরে দুর্গাপূজা পালিত হয়। সেক্ষেত্রে মহালয়ার আগের নবমী তিথিতে পূজা শুরু হয়। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো যে, কালিকা পুরাণে বলা হয়েছে, অষ্টাদশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী উগ্রচণ্ডা তথা দশভুজার বোধন করা হবে কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে, ষোড়শভুজা ভগবতী ভদ্রকালীর বোধন করা হবে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে এবং চতুর্ভুজা ও দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী বিগ্রহের বোধন করা হবে যথাক্রমে শুক্ল প্রতিপদে এবং শুক্লা ষষ্ঠীতে। আবার মহাকাল সংহিতার বিধানে প্রতিমাভেদে উগ্রচণ্ডার কৃষ্ণনবম্যাদিকল্পে, ভদ্রকালীর প্রতিপদাদি কল্পে ও কাত্যায়নী দুর্গার ষষ্ঠ্যাদি কল্পে পূজার অনুষ্ঠান বিধেয়।

পশ্চিমবঙ্গ তথা বাংলাদেশ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যায় প্রচলিত "দুর্গোৎসব" মূলতঃ কালিকাপুরাণে বর্ণিত পদ্ধতি নির্ভর, তবে বলা হয়ে থাকে যে, বাংলায় দুর্গোৎসব মূলতঃ বৃহন্নন্দীকেশ্বর পুরাণ (যার অস্তিত্ব তর্কসাপেক্ষ), কালিকা ও দেবী পুরাণে বিধৃত রীতি অনুযায়ী তিনটি ভিন্নধারায় সম্পন্ন হয়। অনেক সময় আবার মহাকাল সংহিতায় বর্ণিত পদ্ধতির কদাচিৎ অনুসরণ করা হয়, যা তান্ত্রিক দুর্গোৎসব নামে পরিচিত। পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতির জন্য অবশ্য স্মার্ত রঘুনন্দনের দুর্গোৎসবতত্ত্ব ও তিথিতত্ত্বের অনুসরণ করা হয়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে বিদ্যাপতির দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী বা শূলপাণি রচিত দুর্গোৎসববিবেক প্রভৃতি স্মৃতিভাষ্য বা মহাকালসংহিতা/কালীবিলাস তন্ত্র বর্ণিত পদ্ধতিরও অনুসরণ করা হয়। আবার বিহারে দুর্গোৎসব মূলতঃ দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী অনুসারে নিষ্পন্ন হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুর শহরের মৃন্ময়ী মন্দির এবং অনেক পরিবারে এই রীতি প্রচলিত আছে। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাতে দুর্গাসপ্তমী থেকে বিজয়াদশমী পর্যন্ত (শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দুর্গাসপ্তমী থেকে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা পর্যন্ত) চার দিন সরকারি ছুটি থাকে। বাংলাদেশে বিজয়াদশমীতে সর্বসাধারণের জন্য এক দিন সরকারি ছুটি থাকে।

পারিবারিক স্তরে দুর্গাপূজা প্রধানত ধনী পরিবারগুলোতেই আয়োজিত হয়। কলকাতা শহরের পুরনো ধনী পরিবারগুলোর দুর্গাপূজা "বনেদি বাড়ির পূজা" নামে পরিচিত। পারিবারিক দুর্গাপূজাগুলোতে শাস্ত্রাচার পালনের উপরেই বেশি জোর দেওয়া হয়। পূজা উপলক্ষে বাড়িতে আত্মীয়-সমাগম হয়ে থাকে। অন্যদিকে আঞ্চলিক স্তরে এক একটি অঞ্চলের বাসিন্দারা যৌথভাবে যে দুর্গাপূজার আয়োজন করেন তা বারোয়ারি পূজা বা সর্বজনীন পূজা নামে পরিচিত। ভারতে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের সময় সর্বজনীন পূজা শুরু হয়। মূলতঃ দেবী দুর্গাকে মাথায় রেখেই দেশমাতা বা ভারতমাতা বা মাতৃভূমির জাতীয়তাবাদী ধারণা বিপ্লবের আকার নেয়। দেবী দুর্গার ভাবনা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বন্দে মাতরম গানটি রচনা করেন যা ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র। সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদী নেতারা বিভিন্ন সর্বজনীন পূজার সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। এখন সর্বজনীন পূজায় "থিম" বা নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক মণ্ডপ, প্রতিমা ও আলোকসজ্জার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। থিমগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করে বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে "শারদ সম্মান" নামে

বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হয়। এছাড়া বেলুড় মঠসহ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘের বিভিন্ন কেন্দ্রের সন্ন্যাসীরা দুর্গাপূজার আয়োজন করেন। তবে, ঝাড়খন্ডের নিকটবর্তী পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ির চা-বাগানে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসকারী অসুর জাতিগোষ্ঠীর সদস্যরা এই সময়টা শোক হিসেবে পালন করে।

অকালবোধন

শারদীয়া দুর্গাপূজাকে "অকালবোধন" বলা হয়। কালিকা পুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণ অনুসারে, রাম ও রাবণের যুদ্ধের সময় শরৎকালে দুর্গাকে পূজা করা হয়েছিল। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে, শরৎকালে দেবতারা ঘুমিয়ে থাকেন। তাই এই সময়টি তাদের পূজা যথাযথ সময় নয়। অকালের পূজা বলে তাই এই পূজার নাম হয় "অকালবোধন"। এই দুই পুরাণ অনুসারে, রামকে সাহায্য করার জন্য ব্রহ্মা দুর্গার বোধন ও পূজা করেছিলেন। কৃত্তিবাস ওঝা তার রামায়ণে লিখেছেন, রাম স্বয়ং দুর্গার বোধন ও পূজা করেছিলেন। তবে রামায়ণের প্রকৃত রচয়িতা বাল্মীকি মুনি রামায়ণে রামচন্দ্রকৃত দুর্গাপূজার কোনো উল্লেখ করেন নি। উপরন্তু রামায়ণের অন্যান্য অনুবাদেও এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়না। তবে এই প্রচলিত তথ্য অনুসারে স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে শরৎকালে দুর্গাপূজার বিধান দেওয়া হয়েছে। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের মতে, "...অকালবোধন শরতে বৈদিক যজ্ঞের আধুনিক রূপায়ণ ছাড়া আর কিছুই না।"

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ-এ কৃষ্ণকে দুর্গাপূজার প্রবর্তক বলা হয়েছে। বিভিন্ন দেবদেবীরা কীভাবে দুর্গাপূজা করেছিলেন, তার একটি তালিকা এই পুরাণে পাওয়া যায়। তবে এই প্রসঙ্গে কোনো পৌরাণিক গল্পের বিস্তারিত বর্ণনা এই পুরাণে দেওয়া হয়নি।

সৃষ্টির প্রথম যুগে পরমাত্মা কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের আদি-বৃন্দাবনের মহারাসমণ্ডলে প্রথম দুর্গাপূজা করেন। এরপর মধু ও কৈটভ নামে দুই অসুরের ভয়ে ব্রহ্মা দ্বিতীয় দুর্গাপূজা করেছিলেন। ত্রিপুর নামে এক অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে শিব বিপদে পড়ে তৃতীয় দুর্গাপূজার আয়োজন করেন। দুর্বাসা মুনির অভিশাপে লক্ষ্মীকে হারিয়ে ইন্দ্র যে পূজার আয়োজন করেছিলেন, সেটি ছিল চতুর্থ দুর্গাপূজা। এরপর থেকেই পৃথিবীতে মুনিঋষি, সিদ্ধপুরুষ, দেবতা ও মানুষেরা নানা দেশে নানা সময়ে দুর্গাপূজা করে আসছে।

দেবীভাগবত পুরাণ

শাক্তধর্মের অন্যতম প্রধান ধর্মগ্রন্থ দেবীভাগবত পুরাণ অনুসারে, ব্রহ্মার মানসপুত্র মনু পৃথিবীর শাসক হয়ে ক্ষীরোদসাগরের তীরে দুর্গার মাটির মূর্তি তৈরি করে পূজা করেন। এই সময় তিনি "বাগ্‌ভব" বীজ জপ করতেন এবং আহার ও শ্বাস গ্রহণ ত্যাগ করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে একশো বছর ধরে ঘোর তপস্যা করেন। এর ফলে তিনি শীর্ণ হয়ে পড়লেও, কাম ও ক্রোধ জয় করতে সক্ষম হন এবং দুর্গানাম চিন্তা করতে করতে সমাধির প্রভাবে স্থাবরে পরিণত হন। তখন দুর্গা প্রীত হয়ে তাকে বর দিতে আসেন। মনু তখন দেবতাদেরও দুর্লভ একটি বর চাইলেন। দুর্গা সেই প্রার্থনা রক্ষা করেন। সেই সঙ্গে দুর্গা তার রাজ্যশাসনের পথ নিষ্কণ্টক করেন এবং মনুকে পুত্রলাভের বরও দেন।

দেবীমাহাত্ম্যম্

দুর্গা ও দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে যতগুলি পৌরাণিক গল্প প্রচলিত আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় গল্পটি পাওয়া যায় শ্রীশ্রীচণ্ডী বা দেবীমাহাত্ম্যম্-এ। এই গল্পটি হিন্দুরা এতটাই মান্য করে যে শ্রীশ্রীচণ্ডীর পাঠ দুর্গাপূজার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। দেবীমাহাত্ম্যম্ আসলে মার্কণ্ডেয় পুরাণ-এর একটি নির্বাচিত অংশ। এতে তেরোটি অধ্যায়ে মোট সাতশোটি শ্লোক আছে। এই বইতে দুর্গাকে নিয়ে প্রচলিত তিনটি গল্প ও দুর্গাপূজা প্রচলনের একটি গল্প রয়েছে। প্রতিটি গল্পে দুর্গাই কেন্দ্রীয় চরিত্র।

রাজা সুরথের গল্প

রাজা সুরথের গল্পটি শ্রীশ্রীচণ্ডী-র প্রধান তিনটি গল্পের অবতরণিকা ও যোগসূত্র। সুরথ ছিলেন পৃথিবীর রাজা। সুশাসক ও যোদ্ধা হিসেবে তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। কিন্তু একবার এক যুদ্ধে এক যবন জাতির হাতে তার পরাজয় ঘটে। সেই সুযোগে তার মন্ত্রী ও সভাসদেরা তার ধনসম্পদ ও সেনাবাহিনীর দখল নেন। সুরথ মনের দুঃখে বনে চলে আসেন। বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তিনি মেধা নামে এক ঋষির আশ্রমে এসে উপস্থিত হন। মেধা রাজাকে সমাদর করে নিজের আশ্রমে আশ্রয় দেন। কিন্তু বনে থেকেও রাজার মনে সুখ ছিল না। সব সময় তিনি তার হারানো রাজ্যের ভালমন্দের কথা ভেবে শঙ্কিত হতেন। এমন সময় একদিন বনের মধ্যে সুরথ সমাধি নামে এক বৈশ্যের দেখা পেলেন। তার সঙ্গে কথা বলে সুরথ জানতে পারলেন, সমাধির স্ত্রী ও ছেলেরা তার সব টাকাপয়সা ও বিষয়সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাও তিনি সব সময় নিজের স্ত্রী ও ছেলদের কল্যাণ-অকল্যাণের কথা চিন্তা করে শঙ্কিত হন। তাদের মনে প্রশ্ন জাগল, যারা তাদের সব কিছু কেড়ে নিয়েছে, তাদের প্রতি তাদের রাগ হচ্ছে না কেন? কেনই বা তারা সেই সব লোকেদের ভালমন্দের কথা চিন্তা করে করে শঙ্কিত হচ্ছেন? দুজনে মেধা ঋষিকে এই কথা জিজ্ঞাসা করলে, ঋষি বললেন, পরমেশ্বরী মহামায়ার প্রভাবেই এমনটা হচ্ছে। সুরথ তাকে মহামায়ার কথা জিজ্ঞাসা করলে, তিনি একে একে তাকে তিনটি গল্প বলেন। এই গল্পগুলিই শ্রীশ্রীচণ্ডী-র মূল আলোচ্য বিষয়। বইয়ের শেষে দেখা যায়, মেধার গল্প শুনে সুরথ ও সমাধি নদীর তীরে তিন বছর কঠিন তপস্যা ও দুর্গাপূজা করলেন এবং শেষে দুর্গা তাদের দেখা দিয়ে সুরথকে হারানো রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন এবং বৈশ্যকে তত্ত্বজ্ঞান দিলেন।

মধুকৈটভের কাহিনি

শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সংক্ষেপে মধুকৈটভের উপাখ্যানটি বর্ণিত হয়েছে : প্রলয়কালে পৃথিবী এক বিরাট কারণ-সমুদ্রে পরিণত হলে বিষ্ণু সেই সমুদ্রের উপর অনন্তনাগকে শয্যা করে যোগনিদ্রায় মগ্ন

হলেন। এই সময় বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে মধু ও কৈটভ নামে দুই দৈত্য নির্গত হয়ে বিষ্ণু নাভিপদ্মে স্থিত ব্রহ্মাকে বধ করতে উদ্যত হল। ভীত হয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণুকে জাগরিত করবার জন্যে তার নয়নাশ্রিতা যোগনিদ্রার স্তব করতে লাগলেন। এই স্তবটি গ্রন্থে উল্লিখিত চারটি প্রধান স্তবমন্ত্রের অন্যতম। এই স্তবে সন্তুষ্টা দেবী বিষ্ণুকে জাগরিত করলে তিনি পাঁচ হাজার বছর ধরে মধু ও কৈটভের সঙ্গে মহাসংগ্রামে রত হলেন। মহামায়া শেষে ঐ দুই অসুরকে বিমোহিত করলে তারা বিষ্ণুকে বলে বসে, "আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করে আমরা প্রীত; তাই আপনার হাতে মৃত্যু হবে আমাদের শ্লাঘার বিষয়। পৃথিবীর যে স্থান জলপ্লাবিত নয়, সেখানে আপনি আমাদের উভয়কে বিনাশ করতে পারেন।" বিষ্ণু বললেন, "তথাস্তু।" এবং অসুরদ্বয়ের মাথা নিজের জঙ্ঘার উপর রেখে তাদের বধ করলেন।

মহিষাসুরের কাহিনি

শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থে বর্ণিত দেবী দুর্গার কাহিনিগুলির মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় মধ্যম চরিত্রে উল্লিখিত মহিষাসুর বধের কাহিনীটি। এই কাহিনী অনুসারে : পুরাকালে মহিষাসুর দেবতাদের শতবর্ষব্যাপী এক যুদ্ধে পরাস্ত করে স্বর্গের অধিকার কেড়ে নিলে, বিতাড়িত দেবগণ প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং পরে তাঁকে মুখপাত্র করে শিব ও নারায়ণের সমীপে উপস্থিত হলেন। মহিষাসুরের অত্যাচার কাহিনী শ্রবণ করে তাঁরা উভয়েই অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন। সেই ক্রোধে তাঁদের মুখমণ্ডল ভীষণাকার ধারণ করল। প্রথমে বিষ্ণু ও শিব ও পরে ব্রহ্মার মুখমণ্ডল হতে এক মহাতেজ নির্গত হল। সেই সঙ্গে ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবতাদের দেহ থেকেও সুবিপুল তেজ নির্গত হয়ে সেই মহাতেজের সঙ্গে মিলিত হল। সু-উচ্চ হিমালয়ে স্থিত ঋষি কাত্যায়নের আশ্রমে সেই বিরাট তেজঃপুঞ্জ একত্রিত হয়ে এক নারীমূর্তি ধারণ করল। কাত্যায়নের আশ্রমে আবির্ভূত হওয়ায় এই দেবী কাত্যায়নী নামে অভিহিতা হলেন। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথিতে দেবী কাত্যায়নী আবির্ভূতা হয়েছিলেন; শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে কাত্যায়ন দেবীকে পূজা করেন এবং দশমীতে দেবী মহিষাসুর বধ করেন।

যাই হোক, এক এক দেবতার তেজপ্রভাবে বহুবর্ণময়ী দেবীর এক এক অঙ্গ উৎপন্ন হল-শিবের তেজে মুখমণ্ডল, যমের তেজে কেশদাম, সন্ধ্যার তেজে ভ্রূযুগল, অগ্নিতেজে ত্রিনয়ণ। প্রত্যেক দেবতা তাঁদের আয়ুধ বা অস্ত্র দেবীকে দান করলেন। হিমালয় দেবীকে তাঁর বাহনরূপে সিংহ দান করলেন। এই মহাদেবীই অষ্টাদশভুজা জয়া মহালক্ষ্মী রূপে মহিষাসুর বধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। দেবী ও তাঁর বাহনের সিংহনাদে ত্রিভুবন কম্পিত হতে লাগল।

মহিষাসুর সেই প্রকম্পনে ভীত হয়ে প্রথমে তাঁর সেনাদলের বীরযোদ্ধাদের পাঠাতে শুরু করলেন। দেবী ও তাঁর বাহন সিংহ প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করে একে একে সকল যোদ্ধা ও অসুরসেনাকে বিনষ্ট করলেন। তখন মহিষাসুর স্বয়ং দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলেন। যুদ্ধকালে মায়াবী মহিষাসুর নানা রূপ ধারণ করে দেবীকে ভীত বা বিমোহিত করার প্রচেষ্টায় রত হলেন; কিন্তু দেবী সেই সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন। তখন অসুর অহঙ্কারে মত্ত হয়ে প্রবল গর্জন করলেন। দেবী বললেন,

- রে মূঢ়, যতক্ষণ আমি মধুপান করি, ততক্ষণ তুই গর্জন করে নে। আমি তোকে বধ করলেই দেবতারা এখানে শীঘ্রই গর্জন করবেন।

এই বলে দেবী লম্ফ দিয়ে মহিষাসুরের উপর আরোহণ করে, তার কণ্ঠে পা দিয়ে শূলদ্বারা বক্ষ বিদীর্ণ করে তাকে বধ করলেন। অসুরসেনা হাহাকার করতে করতে পলায়ন করল এবং দেবতারা স্বর্গের অধিকার ফিরে পেয়ে আনন্দধ্বনি করতে লাগলেন।

সূত্র : ইন্টারনেট

Md. Tazul Islam Kazal
Proprietor

শারদীয় শুভেচ্ছা

Prianka Syndicate
Customs Clearing & Forwarding Agent

Oishi Traders
General Importer

Dhaka Office :

Meherba Plaza
33, Topkhana Road
(6th Floor) Suit # L
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone : +88 02 9550027
+88 02 9567416

Chattagram Office :

M. F. Tower (4th Floor)
57/60, Badamtoli Agrabad
Chattagram
Phone : 031-2516772-3
Mobile : +88 01713035961
+88 01711525198
E-mail : oishitraders@yahoo.com
E-mail : prsy1995@gmail.com

শারদীয় শুভেচ্ছা

Asha Textile

Manufacturer of Quality Briefs
and Undergarments

1, Nayamati, Narayanganj.
Mobile : 01713000375

Sena Kalyan Insurance Company Ltd.
Fire Insurance
Marine Insurance
Engineering Insurance
Miscellaneous Insurance
Travel Insurance
Personal Accident
Aviation Insurance
Motor Insurance
Your Trusted Risk Manager

ভাসমান বেডে চাষ করলে বিষমুক্ত সবজি মেলে।

প্রধান উদ্দেশ্য ঃ

প্রকল্প এলাকায় শাক সবজি ও মসলা ফসলের উৎপাদন শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি করা এবং পুষ্টিগত অবস্থা কমপক্ষে শতকরা ১০ ভাগ উন্নীত করা।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কর্মপরিকল্পনা

১. জাতীয় কর্মশালা
২. জাতীয় সেমিনার
৩. পিআইসি মিটিং
৪. কৃষক প্রশিক্ষণ
৫. উপকারভোগী কৃষকদের প্রশিক্ষণ
৬. এসএএও প্রশিক্ষণ
৭. কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ
৮. মাঠ দিবস
৯. কৃষক উদ্বুদ্ধকরন সফর
১০. মসলাজাতীয় ফসলের প্রদর্শনী
১১. লতাজাতীয় সবজির প্রদর্শনী
১২. লতাবিহীন সবজির প্রদর্শনী
১৩. অগ্রগতি মনিটরিং
১৪. মধ্যবর্তী মূল্যায়ণ

ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প (ডিএই অংগ)

বাস্তবায়নে ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়।

WORLD AIRLINE
WINNER
SKYTRAX
AWARDS 2023
WORLD'S
BEST
LOW-COST AIRLINE
14
AIRASIA
YEARS RUNNING
AirAsia
HAPPY
DURGA PUJA
FLY DIRECTLY TO MALAYSIA AND THAILAND
AND BEYOND
DHAKA - KUALA LUMPUR - BANGKOK - SINGAPORE - HONG KONG - JAKARTA - YOGYAKARTA
SURABAYA - BALI - BRUNEI - PHNOM PENH - HO CHI MINH - MANILA - HANOI
BOOK NOW
+88 01984 555 666
+88 01321203 268
taareservation@tasaviation.net

SQ CABLES

Speaks Safety & Quality

SKIN COATED CABLES

Our Quality Assures Safety.

BUET

ANAB ACCREDITED

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 005

A Concern Of SQ GROUP

Total Power Solution

+88 01755-661166 info@sqgroupbd.com www.sqgroupbd.com

TVS Racing
TVS
THE NEW COLOUR OF ADRENALINE
PRESENTING
TVS NTORQ 125 PLAY SMART
RACE EDITION
NOW IN MARINE BLUE.
Digital Speedometer
SMARTXONNECT
Best-in-Class Wider Tyre
22 Liter Under Seat Storage with USB charger
Scan to know more
TVS Auto Bangladesh
TVS MOTOR CO. GENUINE PARTS
FREE SERVICE
2 YEARS WARRANTY
www.tvsabl.com
TVS Bangladesh
01919194222, 01919189111